2002

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ◆ ১০ম সংখ্যা

৩০ নভেম্বর, ২০০২ ঈসাব্দ

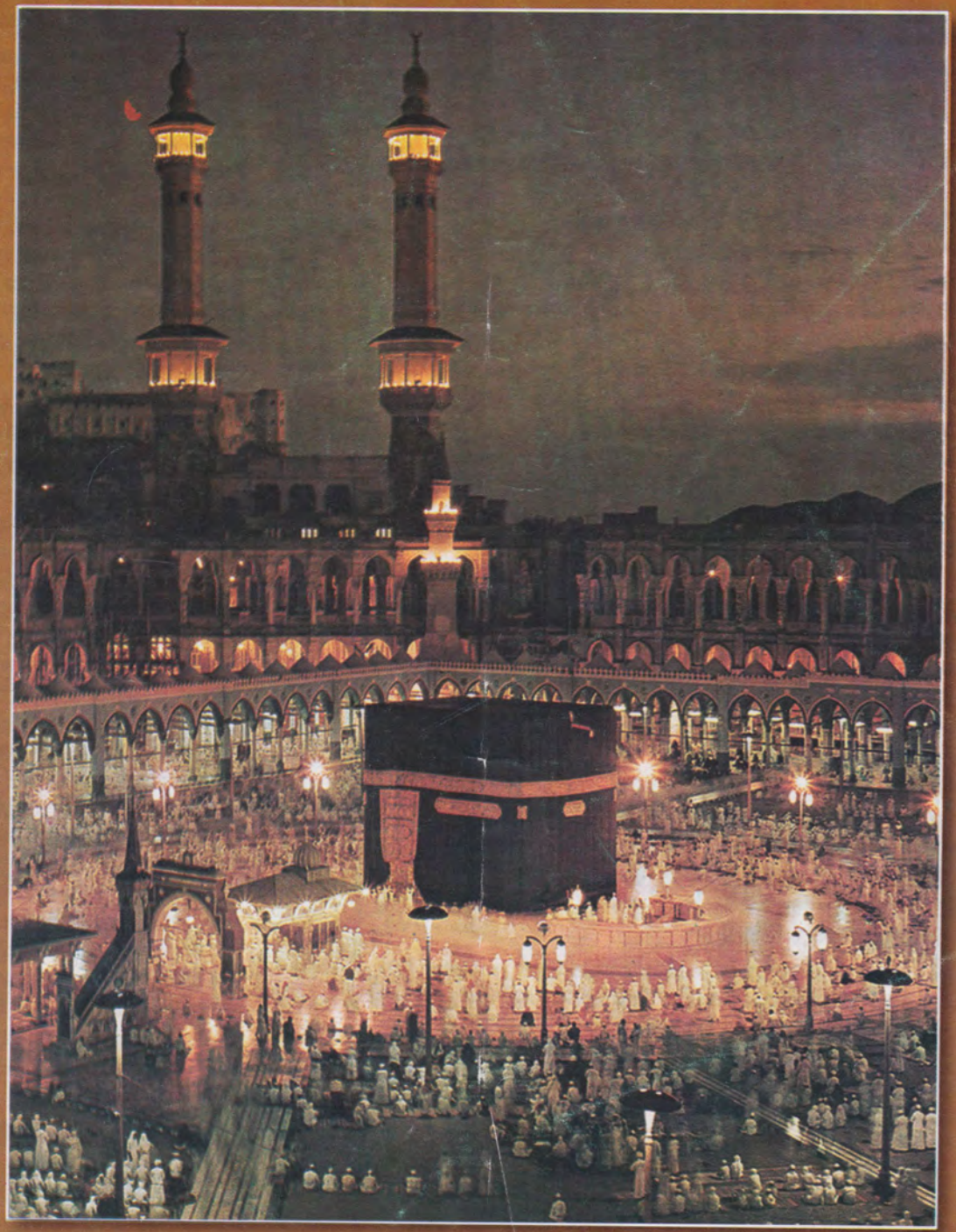

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

ইসলাম প্রচারে অংশ নিন!

আবারও পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছান্তে সকলের দৃষ্টি এ বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করছিঃ

আল্লাহ্তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের জন্যে হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ হিসেবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে যথাসময়ে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত করেছেন। তাঁর (আঃ) মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের লক্ষ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খেলাফতের অধীন 'বায়তুল মাল'। ইহাকে শক্তিশালী করার জন্যে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) ও তাঁর খলীফাগণ (রাঃ) প্রবর্তন করেছেন বিভিন্ন চাঁদার। আজকে ইশআতে ইসলাম ফান্ডে আর্থিক কুরবানীর দু'টি খাত সম্বন্ধে জামাতের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো ঃ

□ **ব্যাংক সুদ** - বর্তমান যুগে ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত নন এমন লোক খুবই বিরল। ব্যাংকের সাথে লেন-দেন করলে ব্যাংক সুদ আদান-প্রদান করে থাকে। ইসলামে 'সুদ' দেয়া বা নেয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং একজন মুসলমানের জন্যে বিষয়টি বড়ই নাজুক। সে সুদ না নিতে পারে আর না ব্যাংককে দিতে পারে অথচ সুদ ব্যতিরেকে বর্তমানে চলা খুবই দুষ্কর। তাই হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) মুসলমানকে বিশেষ করে আহমদী মুসলমানকে এ সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ বাত্লিয়ে দিয়েছেন, আহমদীরা যেন ব্যাংক-সুদের অর্থ জামাতের 'ইশাআতে ইসলাম ফান্ডে' জমা করে দেন। আর এ অর্থ যেন কেবল জামাতের বই-পুস্তক ছাপানোর কাজেই ব্যয় হয়।

□ **ঈদ ফান্ড** - প্রত্যেক জাতির ঈদ বা আনন্দ খুশীর ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন খৃষ্টানদের 'ক্রিসমাচ' হিন্দুদের পূজা-পার্বণ ইত্যাদি। তেমনি মুসলমানদের জন্যে রয়েছে 'ঈদুল ফিতর' 'ঈদুল আযহা'। অন্যান্য জাতি তাদের ঈদ বা খুশীর দিনে অযথা অর্থ ব্যয় করে থাকে। কিন্তু অপব্যয় ইসলামে নিষেধ। ইসলাম খরচাদির ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর জামাতকে তবলীগ তথা আল্লাহ্র পথে মানুষকে ডাকার কাজে বেশি আনন্দ পাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আহমদীদের সবচে' বড় আনন্দ আল্লাহ্র নামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায় এবং তাঁর প্রেরিত নবী (সঃ) কর্তৃক আনীত ধর্ম ইসলামের প্রচারে নিহিত। এজন্যে আহমদী জামাতের সৃষ্টি-লগ্ন থেকে এর প্রবর্তক আহমদীদেরকে ইশাআত তথা ইসলামের প্রচার কার্যে প্রত্যেক ঈদে 'ঈদ ফান্ড'-এ চাঁদা দেবার জন্যে তাগিদ করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে আহমদীরা প্রত্যেকে এ ফান্ডে এক টাকা করে চাঁদা দিতেন। এখন যেহেতু প্রয়োজনও বেড়ে গেছে আর টাকার মূল্যমান খুবই কমে গেছে তাই ঈদের দিনসমূহে 'ঈদ ফান্ডে' বেশি বেশি করে চাঁদা দেবার জন্যে আহমদী ভাই-বোনকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা ঈদের দিনে 'তকবীর'পাঠ করার সাথে সাথে সারা বিশ্বে আল্লাহ্র নামের শ্রেষ্ঠত্ব যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাতেও অংশ নিতে পারি।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ॥ ১০ম সংখ্যা

১৬ অগ্রহায়ণ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ২৪ রমযান ১৪২৩ হিঃ কাঃ
৩০ নবুওয়ত ১৩৮১ হিঃ শাঃ ৩০ নভেম্বর ২০০২ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	-	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন্স

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

ভেবে দেখার বিষয়!

ইদানিং আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য কতিপয় চিহ্নিত মহল থেকে আবারও সরকারের কাছে দাবী তোলা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে দেশবাসীর নিকটে আমরা কতগুলো বিষয়ে পুনঃ প্রশ্ন উত্থাপন করছি।

তারা অনুগ্রহ করে ভেবে দেখবেন, কোন দেশের সরকার নাগরিকদের ধর্ম নিরূপণ করার অধিকার রাখে কি? ধর্ম গ্রহণ ও বর্জন মানুষের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকার। এ দেশের সরকার এ মৌলিক অধিকারের হস্তক্ষেপ করলে অন্যান্য দেশের সরকারও মানুষের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এ মৌলিক অধিকার কুরআন স্বীকৃত। কুরআনের ভাষায় "লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়াদীন"। কোন সরকার যদি মুসলমানদের অমুসলমান ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখে তবে সেই সরকার নিশ্চিতভাবে অমুসলমানদের মুসলমান ঘোষণা দেয়ারও অধিকার রাখে। যদি বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সংসদের কোন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদেশের হিন্দুদেরকে মুসলমান বলে ঘোষণা দেয় তবে কি তারা সত্যি সত্যিই মুসলমান হয়ে যাবে? এ সরকারী সিদ্ধান্ত কি ধর্ম জগতের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ্ পাকের কাছেও গৃহীত হবে? উপরোক্ত নীতিতে ভারতের লোকসভা যদি ভারতীয় মুসলমানদের হিন্দু বলে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তারা সত্যি-সত্যিই কি হিন্দু হয়ে যাবে?

মুসলিম উম্মাহ্র কোন ফিরকা বা সম্প্রদায়কে সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে অমুসলিম বানানোর অর্থই হ'ল উক্ত ঘোষণার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত তারা মুসলমান ছিল তা না হলে ঘোষণার কোন অর্থই হয় না। আমাদের প্রশ্ন, বিশ্বাস পরিবর্তন না করেও কেবল 'সরকারী ঘোষণা' কি কারও ধর্ম পরিবর্তন করে দিতে পারে? কুরআন-হাদীস বা অন্যান্য ধর্মের ঐশী গ্রন্থাদিতে এমন কোন্ নির্দেশ বা নজির আছে কি?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মত তিহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে, এদের মধ্যে একটি ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলি আগুনের পথের পথিক হবে (তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান)। ধর্ম নিরূপণ যদি সরকারী ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে সরকারের উচিত প্রথমে খাঁটি মুসলমান ফিরকাটিকে চিহ্নিত করে বাদ বাকী সবগুলোকে অমুসলিম ঘোষণা করা। মৌলবী-মৌলানা সাহেবদের মধ্য থেকে যারা 'আহমদীয়া মুসলিম ফিরকা'কে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবী তুলেছেন তারা নিজেদের 'মুসলমানিত্বের' সার্টিফিকেট কোন্ সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে লাভ করেছেন কি? না হলে তাদের মুসলমানিত্বের মাপকাঠি কি?

আহমদীগণ পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'-তে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী। এছাড়া নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত তারা যথারীতি পালন করে। তা সত্ত্বেও যদি তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয় তাহলে কুরআন হাদীস প্রদত্ত মুসলমানের সংজ্ঞাকে বদলাতে হবে। সরকার কি মুসলমানের সংজ্ঞাকে পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে? আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কোন ধর্ম গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা দান করেছেন। তাই ধর্ম বিষয়ে বিচার করার অধিকার একমাত্র তিনিই রাখেন। সরকার যদি এ অধিকার নিজ হাতে তুলে নেয় আল্লাহ্তাআলা কি সেই সরকারের উপর সন্তুষ্ট হবেন? যে সরকারই এ ধরনের খোদকারী করেছে ইতিহাসে তারা আস্তকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

সুতরাং যারা আজকে আহমদী মুসলমানদের অমুসলমান বানাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন তাদের কাছে আমাদের নিবেদন, মস্তিষ্ক গরম না করে আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতার বই-পুস্তকগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন। আমরা জানি বিরুদ্ধবাদীরা এগুলো পাঠ না করেই সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছেন, নচেৎ বিষয়টি আল্লাহ্র ওপরে ছেড়ে দিন। কেননা, একদিন সকলকে তো তাঁরই সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। তাঁর নির্দিষ্ট মানদন্ডে বিচার করা হবে কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়।

-নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
■ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ - ৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
■ হাদীস শরীফ ঃ জুলুম করা নিষেধ	ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৪
■ অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ মৌঃ মুহাম্মদ আজিম উদ্দীন আহমদ	৫
■ জুমুআর খুতবা ঃ মেহমানদারীর কতিপয় দিক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৬-৮
■ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	৯-১০
■ ঐশী-বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন	১১-১২
■ প্রশ্নোত্তর	ঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	১৩-১৪
■ মহান সৃষ্টির অন্তরালে	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	১৪-১৫
■ মুনাজাতে রসূল (সঃ) - মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৬-১৭
■ কবিতা ঃ জাগার গান	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	১৭
■ স্মৃতি কণা	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী	১৮
■ ইসলাম ধর্মের পরস্পর সহযোগিতা	ঃ জনাব আমীর মাহমুদ ভুঁইয়া	১৮-১৯
■ ছোটদের পাতা ঃ ফুলের তোড়া (গুলদাস্তা) (১০-১৩ বছর বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক)	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২০
■ সন্তানদের চরিত্র গঠনে আনসারুল্লাহ্র দায়িত্ব	ঃ জনাব খোন্দকার আজমল হক	২১-২২
■ মরহুম মোহর আলী মাষ্টার	ঃ জনাব আখতারুজ্জামান	২৩-২৪
■ নতুনদের পাতা		
● আমার আম্মাজান	ঃ জনাব এহসানুল হাবীব জয়	২৫-২৬
● মুসলিম আইনে মোহরানার ভূমিকা	ঃ মিস তাহেরা আনোয়ার স্মৃতি	২৬-২৭
● হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা	ঃ মৌঃ শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমীন	২৮-৩০
■ সংবাদ	ঃ	৩১-৩২

প্রচ্ছদ ঃ পবিত্র কা'বা ঘর।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার ঈমানবর্ধক ঘটনা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"স্মরণ রাখো, খোদার বান্দাদের দোয়ায় গ্রহণীয়তা পৌঁছানোর জন্যে দোয়া গৃহীত হওয়াও একটি বড় নিদর্শন বরং দোয়ার গ্রহণীয়তা ব্যতিরেকে আর কোনই নিদর্শন নেই। কেননা, দোয়ার গ্রহণীয়তা দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, ঐশী দরবারে এক বান্দার মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। যদিও দোয়া কবুল হয়ে যাওয়া অবশ্যই বাধ্যবাধকতার গন্ডীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কখনও কখনও পরাক্রম ও প্রতাপের অধিকারী খোদা নিজের ইচ্ছাকেও প্রাধান্য দিয়ে থাকেন কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহ্তাআলার দোয়া গৃহীত বান্দাদের জন্যে এটাও একটি নিদর্শন যে, অন্যদের তুলনায় তাদের দোয়া অধিক সংখ্যায় গৃহীত হয়ে থাকে এবং কবুলিয়তের মর্যাদার দিক থেকে অন্য কোন দোয়া কবুলকারী তাদের মোকাবেলা করতে পারে না। আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমার হাজার হাজার দোয়া কবুল হয়েছে। যদি আমি সবগুলো

কালামুল ইমাম

সম্বন্ধে লিখি তাহলে এর একখানা পুস্তক তৈরী হবে" (হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা ৩২১, রূহানী খাযায়েন ২২ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৪)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর পুস্তক নযূলুল মসীহ্, তিরইয়াকুল কুলূব ও হাকীকাতুল ওহীতে দোয়ার কবুলিয়তের নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ হুযূর (আঃ)-এর ভাষায়ই কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা যাচ্ছে ঃ

"একবার টাকা পয়সার বিশেষ প্রয়োজন দেখা গেলো। এ ব্যাপারে আমাদের এখানকার আর্য লালা শরমপত ও মালওয়ামল খুব ভাল জানতেন। আর তাদের এ-ও জানা ছিলো যে, বাহ্যিকভাবে এমন কোন উপায় ছিলো না যদ্বারা টাকা-পয়সা আসার আশা করা যেতে পারতো। শেষ পর্যন্ত দোয়া করার আবেগ সৃষ্টি হলো যেন অসুবিধা দূর হয়ে যায় এবং এসব লোকদের জন্যে নিদর্শনও প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং দোয়া করা হলো যেন আল্লাহ্তাআলা নিদর্শন হিসেবে আর্থিক সাহায্যের সংবাদ দিয়ে দেন। তখন ইলহাম হলো ঃ

দশ দিন পরে আবেগ দেখাবো আলা ইন্না নাস্রাল্লাহি ক্বরীবুন ফী শাইলিন মিকইয়াসিন দেন উইল ইউ গো টু অমৃতসর অর্থাৎ দশ দিন পর টাকা আসবে খোদার সাহায্য নিকটবর্তী আর যেভাবে যখন উট্নী বাচ্চার জন্ম দেয়ার জন্যে লেজ তুলে দেয় সেভাবেই তার শিশুর জন্ম গ্রহণ ঘনিয়ে আসে এভাবেই ঐশী সাহায্য নিকটবর্তী রয়েছে। দশ দিন পর যখন টাকা আসবে তখন তুমি অমৃতসরও যাবে। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উল্লেখিত আর্যদের সামনে ঘটনাটি ঘটলো। অর্থাৎ দশ দিন পর্যন্ত কিছুই আসলো না। ১১তম দিন মুহাম্মদ আফজল খান সাহেব রাওয়ালপিন্ডি থেকে ১১০ টাকা পাঠালেন। ১০ টাকা অন্য এক স্থান থেকে আসলো। এর পর ধারাবাহিকতার সাথে এমনভাবে টাকা আসতে শুরু করলো যার কোন আশাই ছিলো না (তিরিয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, ১৫ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৭-২৫৮)

উপস্থাপন ও অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

সূরাতুল আ'রাফ - ৭

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ
اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ
وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১৫৭। আর তুমি আমাদের জন্য কল্যাণ নির্ধারিত কর এ দুনিয়াতে এবং পরকালেও; নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে (তওবা করে) এসে গেছি।' তিনি বললেন, 'আমি যাকে চাই আমার আযাব দিয়ে থাকি; কিন্তু আমার কৃপা সব কিছুকে ঘিরে আছে, অতএব আমি এটা অবশ্যই তাদের জন্য নির্ধারিত করবো যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনে,

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ
مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۡ يَاْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ
وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ
عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১৫৮। যারা এ রসূলকে-এ উম্মী নবীকে[১০৫৮] অনুসরণ করে, যার সম্পর্কে তারা তাদের নিকট তওরাত ও ইন্জীলে[১০৫৯] লিখিত দেখতে পায়। সে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয় ও মন্দকাজ করতে তাদেরকে নিষেধ করে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তুকে হালাল (নির্ধারণ) করে অপবিত্র বস্তুকে তাদের জন্য হারাম (নির্ধারণ) করে ও তাদের বোঝা ও তাদের গলার বেড়ি যা তাদের ওপর (চেপে) ছিল, তা তাদের থেকে নামিয়ে দেয়। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাকে সম্মান ও সমর্থন দিয়েছে আর সাহায্য করেছে ও যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করেছে, তারাই সফলকাম।'

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ
لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ
يُمِيْتُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

১৫৯। তুমি বল, 'হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য[১০৬০] সেই আল্লাহ্‌র রসূল, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিতও করেন এবং তিনি মৃত্যুও ঘটান। অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র ওপর এবং তাঁর এ রসূল- এ উম্মী নবীর ওপর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীসমূহের ওপর, এবং তোমরা তাকে অনুসরণ কর যাতে তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।'

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝

১৬০। এবং মূসার জাতির মধ্যেও এমন কিছু লোক ছিল যারা সত্যের সাহায্যে (লোকদেরকে) পথ দেখাতো ও তারই সাহায্যে ন্যায়-বিচার করতো।[১০৬১]

১০৫৮। উম্মী অর্থ-মাতার অংশস্বরূপ বা অঙ্গীভূত হওয়া বা অধিকারভুক্ত হওয়া অর্থাৎ মায়ের বুকের শিশু যেমন নির্দোষ নিষ্পাপ; এমন ব্যক্তি যে ঐশী গ্রন্থের অধিকার নয়। বিশেষভাবে একজন আরববাসী, এমন ব্যক্তি যে লিখতে বা পড়তে জানে না, যারা উম্মুল-কুরা অর্থাৎ জনপদ-জননী মক্কার অধিবাসী হিসাবে পরিচিত।

যদি "উম্মী" শব্দ নিরক্ষর (অর্থাৎ যে লিখাপড়া জানে না) অর্থে গ্রহণ করা হয়, তা হলে এ আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় যে, যদিও মহানবী (সঃ) কোন প্রকারের লেখা-পড়াই করেন নি এবং নিরক্ষর ছিলেন, তথাপি আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে অনুগ্রহপূর্বক এমন জ্ঞান দান করেছিলেন যার দ্বারা আঁ হযরত (সঃ) অত্যন্ত উন্নত জ্ঞানী, সভ্য ও শিক্ষিত অবস্থার লোকদেরকেও পথনির্দেশ ও আলোর সন্ধান দিতে পারতেন। কতক খৃষ্টান লেখক নবী করীম (সঃ)-এর নিরক্ষর হওয়ার বাস্তব ঘটনাকে সন্দেহ করার ভান করেছেন। রেভারেন্ড হোয়েরী তার রচিত (কুরআন মজীদ-এর) ভাষ্যে মন্তব্য করেছেন ঃ

"ইহা কি সম্ভব ছিল যে- আলীর সাথে অভিন্ন পরিবারে লালিত-পালিত হয়ে আলী পড়িতে ও লিখিতে জানিতেছেন কিন্তু তিনি অনুরূপ শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। বছরের পর বছর ধরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সওদাগরী ব্যবসা দক্ষতার সহিত তিনি কি অক্ষর-জ্ঞান ছাড়াই পরিচালনা করিয়াছিলেন? তিনি যে লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন, ইহা তাঁহার শেষ বছরগুলিতে প্রমাণিত। হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার সাহাবা এবং অন্যতম সচীব মুয়াবিয়াকে বলিয়াছিলেন ঃ 'বা' কে সরলভাবে টান এবং 'সীন' কে স্পষ্টরূপে বিভক্ত কর ইত্যাদি, এবং তাঁর বিদায় মুহূর্তে তিনি লেখার সরঞ্জামাদি চাহিয়াছিলেন। কাতেব বা শ্রুতিলেখকদিগকে ব্যবহার তাঁহার লিখিতে জানার বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী যুক্তি নহে, কারণ অনুরূপভাবে কাতেবের ব্যবহার সেই যুগে সাধারণ ছিল, এমনকি জ্ঞানী পন্ডিতদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।" কিন্তু এটা একটা দুর্বল যুক্তির অবতারণা যে, যেহেতু নবী করীম (সঃ) "আলী (রাঃ)-এর সাথে একই পরিবারে লালিত-পালিত হয়েছিলেন সেহেতু তিনি পড়িতে ও লিখিতে জানিতেন বা সেই কারণে তাঁরও পড়া লেখা জানা সম্ভব ছিল"। ইহা কেবল রেভারেন্ড ভদ্রলোকের পক্ষে মহানবী (সঃ)-এর জীবনের প্রাথমিক ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। হযরত আলী (রাঃ) এবং নবী করীম (সঃ) একত্রে লালিত-পালিত হতে পারেন না, তাঁদের বয়সের অনেক বছরের ব্যবধান হওয়ার কারণে। আলী (রাঃ) থেকে আঁ. হযরত (সঃ) উনত্রিশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। হযরত নবী করীম (সঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর এক সঙ্গে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার যুক্তিতে হস্তক্ষেপ না করলে তাঁদের দু'জনের বয়সের বিরাট পার্থক্য দ্বারা স্পষ্ট ও নিশ্চিতরূপে নাকচ হয়ে যায়, হযরত আলীই বরং হযরত নবী আকরম (সঃ)-এর গৃহে এবং তাঁরই নিজের পালনে ও তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন (হিশাম)। আঁ হযরত (সঃ) তাঁর চাচা আবূতালেবের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন তখন, যখন তিনি অত্যন্ত স্বল্প আয়ের লোক ছিলেন। আবূতালেব শিক্ষা-দীক্ষায় মূল্য উপলব্ধি করতেন না, এবং তাঁর সময়ে তাঁদের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি খুব একটা সোপার্জিত সম্পদরূপে বিবেচিত হতো না। অতএব পবিত্র মহানবী (সঃ) আবূতালেবের গৃহে নিরক্ষরই রয়ে গেলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর গৃহে হযরত আলী প্রতিপালিত হয়েছিলেন। খ্যাতনামা ধনী মহিলা খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে তাঁর (সঃ) বিবাহ হওয়ার কারণে প্রচুর সম্পদ তাঁর হস্তে ন্যস্ত হয়েছিল। তিনিও বুঝেছিলেন সুশিক্ষা কীরূপ অমূল্য বস্তু। সুতরাং তাঁর প্রযত্নে ও মহান প্রভাবাধীনে আলী, সেই যুগের বিবেচনা মতে, স্বাভাবিকরূপে সুশিক্ষিত যুবকে পরিণত হলেন।

হোয়েরী সাহেবের দ্বিতীয় আপত্তি-যদি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিরক্ষর হতেন অর্থাৎ লিখতে এবং পড়তে না জানতেন, তা হলে তিনি প্রকৃতপক্ষে এরূপ খ্যাতিসম্পন্ন ও সফল ব্যবসায়ী হতে পারতেন না। তার এ ধারণার জন্ম হয়েছে নবী করীম (সঃ)-এর যুগের উন্নত কৃতকার্য ব্যবসায়ী সম্পর্কে ভ্রান্ত কল্পনাহেতু। হোয়েরী সাহেব এরূপ আপত্তি উত্থাপন করতেন না, যদি তিনি জানতেন যে, এ বিংশ শতাব্দীতেও এশিয়ার মধ্যে এমন অনেক উচ্চ স্তরের অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী রয়েছে যারা, এমন কি প্রাথমিক শিক্ষাও পান নি। মহানবী (সঃ)-এর সময়ে মক্কাতে বিদ্যাশিক্ষা খুব একটা সুনজরে দেখা হতো না। অল্পসংখ্যক লোকেই লিখতে ও পড়তে জানতো, কিন্তু অনেক লোকই জাঁকালো ও সমৃদ্ধ ব্যবসা সফল ও সার্থকভাবে পরিচালনা করতো। আরবে সেই যুগে ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য বিদ্যা শিক্ষা অপরিহার্য শর্ত বা যোগ্যতারূপে বিবেচিত হতো না। অধিকন্তু খাদীজা (রাঃ) নবী করীম (সঃ)-কে মাইসারাহ্ নামের এক কৃতদাস দিয়েছিলেন, যে সকল সওদাগরী সফরে তাঁর সঙ্গে থাকতো এবং সে পড়ালেখাও জানতো। এ বাস্তব ঘটনা হোয়েবী সাহেবের মন্তব্যের ভিত্তিতে ভূমিসাৎ করে দেয়।

নবী করীম (সঃ) মুয়াবিয়াকে 'বা' এবং "সীন" সঠিকভাবে লিখতে যে আদেশ দিয়েছিলেন বলে বর্ণিত হাদীসটি খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। আব্বাসীয়দের শাসন আমলে উমাইয়াদেরকে ছোট করার জন্য অনেক বর্ণনা হাদীস শরীফে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। উক্ত হাদীসে এটা দেখাবার

প্রচেষ্টা হয়েছে যে, খ্যাতিমান উমাইয়া বংশের বিশিষ্ট এক প্রধান ব্যক্তিত্ব মুয়াবিয়ার মত নেহায়েত অল্প শিক্ষার মানুষ ছিল, যে নাকি 'বে' এবং 'সীন'-এর মত সহজ অক্ষরকেও শুদ্ধভাবে লিখতে পারতো না। যা হোক, যদি বর্ণিত হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বলেও প্রমাণিত হয়, তাতেও প্রতিপন্ন হয় না যে, আঁ হযরত (সঃ) লিখা পড়া জানতেন, কেননা অপরের দ্বারা কুরআন লেখাতে লেখাতে সঠিকভাবে লিখবার নির্দেশ দেয়া তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না।

হযরত রসূলে করীম (সঃ) জীবনের শেষ মুহূর্তে কাগজ কলম আনতে বলেছিলেন, এ বাস্তব ঘটনাও হোয়েরী সাহেবের অনুমানকে সমর্থন করে না। ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে, যখনই আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট কোন আয়াত নাযেল হতো তখনই তিনি কাগজ-কলম আনতে বলতেন এবং তাঁর লেখকদের মধ্যে একজনকে নাযেলকৃত আয়াত লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন। অতএব হুযূর (সঃ) কেবল কাগজ কলম আনতে বলার কারণে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি নিজে লিখতে পড়তে জানতেন। তার তর্কের সমর্থনে উত্থাপিত উক্তিটি অর্থাৎ "পড় তোমার প্রভুর নামে" তার পক্ষে কোন কিছু প্রমাণ করে না। ৯৬ঃ২ আয়াতে ব্যবহৃত আরবী "ইক্‌রা" (পড়) শব্দের অর্থ লিখিত কোন বিষয়কে কেবল পড়া বুঝায় না, এর অর্থ এ-ও হয় যে, অন্যের নিকট থেকে শুনে পুনরাবৃত্তি করা, পুনঃ পুনঃ উচ্চ কণ্ঠে বলা বা পড়া। এতদ্ব্যতীত হাদীস শরীফ থেকে এ ঘটনার প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ এই যে, প্রথম ওহী নাযেল হওয়ার সময় জিব্‌রাঈল ফিরিশ্‌তা "ইক্‌রা" (পড়) শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, কোন লিখা বস্তু নবী করীম (সঃ)-এর সম্মুখে পড়ার জন্য এটা স্থাপন করেন নি। তাঁকে শুধু বলা হয়েছিল মৌখিক পুনরাবৃত্তি করতে যা ফিরিশ্‌তা তাঁর নিকট আবৃত্তি করেছিলেন। অধিকন্তু কোন কোন খৃষ্টান লেখকের দাবী এই যে, নবী করীম (সঃ) পড়া লিখা জানতেন না, এ ধারণার সূচনা হয়েছিল, তাঁর পুনঃ পুনঃ এ দাবীর মাধ্যমে যে, তিনি "নিরক্ষর নবী" (অর্থাৎ উম্মী নবী)। এই দাবী যেমন বিস্ময়কর তেমনি দুর্বল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার যে, তিনি যাদের সঙ্গে বছরের পর বছর দিবা-রাত্র বসবাস করতেন, এবং যারা প্রতিদিন তাঁর (উক্ত দাবী মতে) পড়তে ও লিখতে দেখেছিল, তারা আবিষ্কার করতে পারলো না যে, তিনি "উম্মী" (নিরক্ষর) ছিলেন কি-না, এবং তারা এ ভ্রান্ত বিশ্বাসে পরিচালিত হয়েছিল শুধু তাঁর পুনঃ পুনঃ এ ঘোষণা বা দাবীর কারণে যে, তিনি উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর শ্রুতিলেখকের ব্যবহার দ্বারা তাঁর লিখন-বিদ্যা না জানা প্রমাণিত হয় না, কারণ কাতেব ব্যবহারের এরূপ রীতি সেই যুগে প্রচলিত ছিল, এমনকি বিদ্বান লোকদিগের মধ্যেও ছিল - হোয়েরী সাহেবের এ যুক্তিতর্ক আরব এবং ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রকৃত ঘটনা হলো, রসূলে করীম (সঃ)-এর যামানায় আরবদের মধ্যে 'ওলামা' অথবা বিদ্বান পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ এ অর্থে ছিল না, যে অর্থে এ যুগে উক্ত শব্দ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তারা শ্রুতিলেখক এবং কারণিক রাখতেও অভ্যস্থ ছিল না। এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যে, কোন একজন আরববাসী কাতেব নিযুক্তি করেছিল। বিদ্বান-পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের সর্বসম্মত পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমত এটাই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত পড়তে এবং লিখতে জানতেন না। এ বিষয়ে কুরআন করীমে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, এ নবী (সঃ) নিরক্ষর ছিলেন, অন্ততঃ আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত নবীরূপে দাবী অবধি (২৯ঃ৪৯), যা হোক জীবনের শেষ দিকে তিনি কয়েকটি শব্দের পাঠোদ্ধার করতে শিখেছিলেন মাত্র।

১০৫৯। নবী করীম (সঃ)-এর সম্পর্কে বাইবেলের কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী দেখুন।

১০৬০। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্বে আবির্ভূত আল্লাহ্‌তাআলার সকল নবী জাতীয় নবী ছিলেন, তাঁদের শিক্ষা সেই জাতির উদ্দেশ্যে ছিল, যে জাতির নিকট তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সেই বিশেষ কালের জন্য যে সময়ে তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল। পক্ষান্তরে পবিত্র মহানবী (সঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র মানব জাতির জন্য, সর্বকালের জন্য। মানবেতিহাসে তাঁর আবির্ভাব এক অনুপম ঘটনা। এর উদ্দেশ্য সকল পৃথক পৃথক জাতি ও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে একই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণজনিত সকল ভেদাভেদ বিলীন হয়ে যাবে।

১০৬১। হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে সকলেই অসাধু ছিল না। তাদের একদল শুধু নিজেরাই ভাল ছিল না, অধিকন্তু অন্যদেরকেও সত্যের পথে পরিচালিত করতো এবং ন্যায় কাজ করতো। পবিত্র গ্রন্থ কুরআন কখনও কোন জাতিকে ঢালাওভাবে নির্বিচারে নিন্দা করে না।

হাদীস শরীফ

জুলুম করা নিষেধ

কুরআন ঃ

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٩﴾

অর্থ ঃ এবং তুমি তাদেরকে সেই আসন্ন (প্রতিশ্রুত) দিবস সম্বন্ধে সতর্ক কর, যখন হৃদয়গুলো অন্তর্নিহিত দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায় কণ্ঠাগত হবে। তখন জালেমদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) হবে না যার শাফায়াত গ্রহণ করা যেতে পারে। (সূরাতুল মু'মিন ঃ ১৯)।

হাদীস ঃ

আন জাবেরিন আন্না রসূলাল্লাহে ক্বালা ইত্তাকূয যুলমা ফাইন্নায্ যুলমা যুলুমাতুন ইয়াওমাল কিয়ামাতে ওয়াত্তাকূশ্ শুহ্‌হা ফাইন্নাশ্ শুহ্‌হা আহলাকা মান কানা কাবলাকুম হামালাহুম আন সাফাকূ দিমাআহুম ওয়াসতাহাললু মাহারেমাহুম।

অর্থাৎ জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা জুলুম করা থেকে দূরে থাকো। কেননা জুলুম কেয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে। তোমরা কৃপণতার কলুষতা থেকেও দূরে থাকো। কেননা কৃপণতাই তোমাদের পূর্বের অনেক লোককে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদেরকে রক্তপাত ও মারামারি করতে প্ররোচিত করেছে এবং হারামকে হালাল করতে উস্কানি দিয়েছে। (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কুরআন জালেমদের সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করেছে যে, তারা কিয়ামতের দিন বড় কষ্টে থাকবে। তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং সেদিন তাদের জন্য কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, জুলুম করা নিষেধ। মানুষ নিজের উপরও জুলুম করে ও অন্যের উপরও যুলুম করে থাকে। খোদাতাআলার নির্দেশ অমান্য করাই বড় জুলুম, এছাড়া হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দার হককে আদায় না করাও বড় জুলুম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করাকে বড় জুলুম বলে অভিহিত করা হয়েছে।

উপরোক্ত হাদীস শরীফে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) জুলুম থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। এখানে দু'ধরনের জুলুমই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ। এ জুলুমের পরিণাম মানুষকে কিয়ামতের দিন ভোগ করতে হবে। তিনি (সঃ) জানাচ্ছেন, কিয়ামতের দিন এ জুলুম জালেমের উপর অন্ধকার ধোঁয়ায় পরিণত হবে। অর্থাৎ তারা খোদার রহম হতে বঞ্চিত হবে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক জুলুম করে থাকি। যেমন খুবই নগণ্য কিন্তু খুবই বড় ব্যাপার আর ত হলো মজদুরের হক, হোক সে কর্মচারী, চাকর বা অন্য কোনভাবে সেবাদানকারী। আমরা কিন্তু তাদের সাথে ভালো ব্যবহারও করি না এর পারিশ্রমিকও সঠিক দেই না। এভাবে প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার, আত্মীয়-স্বজনের সাথে মন্দ ব্যবহার অন্যের হক মেরে খাওয়া এগুলো সবই জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সবাইকে হাদীসের আলোকে এমন জুলুম হতে বিরত থাকতে হবে তবেই আমরা বড় বড় জুলুম হতে বাঁচতে পারবো।

জুলুমের সাথে হুযূর (সঃ) কৃপণতার কথাও বলেছেন। গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, লোভ মানুষকে জুলুম করতে বাধ্য করে, অন্যায়কারীর মাঝে কৃপণতা অবশ্যই পরিলক্ষিত হবে। কৃপণতা মানুষকে ব্যাপকভাবে জুলুম করতে বাধ্য করে। তাই হুযূর (সঃ) কৃপণতা হতে দূরে থাকতে বলেছেন। আল্লাহ্ করুন আমার জুলুমের প্রতিটি ক্ষেত্র হতে দূরে থেকে খোদার রহমতের ছায়ায় থাকি আর পৃথিবীর মানুষের মাঝে রহম বন্টনকারী হই, আমীন।

সংকলন ও অনুবাদ - মাওলানা সালেহ আহমদ,
মুরব্বী সিলিসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

চশমায়ে মসীহী

(৪র্থ কিস্তি)

আস্‌সালামু আলায়কুম। আপনি "ইয়া নাবিউল ইসলাম" নামক খ্রীষ্টান পুস্তক পাঠ করে আমাকে যে পত্র লিখেছেন তা আমি অতি দুঃখের সাথে পাঠ করেছি। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, যাদের খোদা মৃত্যুমুখে পতিত যাদের ধর্ম মৃতধর্মে পরিণত, যাদের ধর্মগ্রন্থ জীবনশক্তিশূন্য ও আধ্যাত্মিক চক্ষু হীনতায় যা স্বর্বস্বান্ত ও প্রাণহীন তাদের অসত্য কথা ও অপবাদ সম্বলিত কাহিনী অধ্যয়নে আপনি আজ ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ করেছেন? (ইন্না লিল্লাহি ... রাজিউন)।

আপনি স্মরণ রাখবেন, এ জাতি ধর্মের উন্নতিকল্পে অসত্য প্রচার ও অপবাদ সম্বলিত পুস্তক রচনায় জগতের যাবতীয় জাতির অগ্রণী হয়েছে। সত্যের সহায়কল্পে যে জ্যোতিঃ স্বর্গ হতে অবতীর্ণ হয়ে ক্রমান্বয়ে বহুসংখ্যক প্রমাণ ও নিদর্শন দ্বারা সত্য ধর্মকে স্পষ্ট পৃথক করে দেখিয়ে দেয়, সে ধর্মীয় জ্যোতিঃ তাদের সমীপে মজুদ নেই বলে তারা চিরজীবিত ও জ্যোতির্ময় ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে মানব হৃদয়ে অসন্তোষ জন্মাতে নানাবিধ মিথ্যা কথা, প্রতারণা, ছলনা, ধোঁকাবাজী ও জালিয়াতি প্রভৃতি অসদুপায় অবলম্বন করে। এদের হৃদয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও কালিমাময়। এরা খোদাকে ভয় করে না। কীরূপে মানুষ আঁধারের সাথে প্রেম করে আলো পরিত্যাগ করবে দিবারাত্রি এরা সেই উপায় উদ্ভাবনায় ব্যস্ত। আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে এরূপ লোকের প্রণীত পুস্তক পাঠে বিচলিত হতে দেখে আমি বড়ই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। যে যাদুকররা মূসা নবীর সম্মুখে রজ্জুগুলোকে সাপে পরিণত করে দেখিয়েছিল, এরা সেই যাদুকরদেরকেও অতিক্রম করেছে। কিন্তু যেমন মূসা খোদার নবী বলে তাঁর ষষ্ঠি তাদের সাপগুলোকে গিলে ফেলেছিল, সেরূপ কুরআন শরীফ খোদার ষষ্ঠি বলে দিন দিন এদের রজ্জু সর্পগুলোকে গ্রাস করছে। এমন এক সময় আসবে বরং সে সময় অতি নিকটবর্তী, যখন এ রজ্জু নির্মিত সর্পগুলোর নাম ও চিহ্ন ধরাতল হতে বিলুপ্ত হবে। 'ইয়া নাবিউল ইসলাম' প্রণেতা যদিও ইহা দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, কুরআন অমুক অমুক গল্পকাহিনী বা গ্রন্থসমূহ হতে সঙ্কলিত হয়েছে কিন্তু তাঁর কৃতকার্যতা, জনৈক ইহুদী বিজ্ঞ পণ্ডিত ইঞ্জিলের মূল নির্ণয় করতে যে চেষ্টা করেছেন, তাঁর কৃতকার্যতার হাজার ভাগের এক ভাগও নয়। উক্ত পণ্ডিত তাঁর মতে সপ্রমাণ করেছেন যে, ইঞ্জিলের নৈতিক শিক্ষা ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্র "তালমূদ" ও অন্যান্য কতগুলো ইহুদী পুস্তক হতে সংগৃহীত এবং এ অপহরণকার্য এতই সুস্পষ্ট যে, পাতার পর পাতা অক্ষরে অক্ষরে নকল করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, ইঞ্জিল শুধু অপহৃত সামগ্রীর সমষ্টি মাত্র; বিশেষতঃ 'পাহাড় শিক্ষা' 'Sermon on the Mount' কে যা নিয়ে খ্রীষ্টানগণ এত গর্ব করেন, 'তালমুদ' হতে শব্দে শব্দে, উদ্ধৃত করে সম্পূর্ণরূপে এরই লিখিত বর্ণনা ও বাক্যাবলী বলে প্রমাণ করেছেন। এরূপে অন্যান্য পুস্তক হতে বহু অপহৃত বাক্য উদ্ধৃত করে জগদ্বাসীকে চমৎকৃত করে তুলেছেন। ইউরোপীয় সুবিজ্ঞ সমালোচক পণ্ডিতগণও, আজ আন্তরিক অনুরাগের সাথে এ দিকে আকৃষ্ট। বর্তমান যুগে আমি জনৈক হিন্দু রচিত একখানা পুস্তক পাঠ করেছি। এতে তিনি ইঞ্জিলকে বুদ্ধের ধর্মনীতি হতে সঙ্কলিত ও অপহৃত পুস্তক বলে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়ে বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা উদ্ধৃত করতঃ তার প্রমাণ দিয়েছেন। আরও আশ্চর্য বিষয় এই, শয়তান বুদ্ধকে পরীক্ষা করতে কয়েক স্থানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে নানারূপে চেষ্টা করেছে বলে বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত এক অতি প্রসিদ্ধ গল্প ইঞ্জিলেও লিখিত আছে দেখে সকলেই এ ধারণা করতে পারেন যে, সামান্য পরিবর্তন সহ ঐ অপহৃত বৌদ্ধ গল্পই বাইবেলে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তা সুচারুরূপে প্রমাণিত হয়েছে, হযরত ঈসার কবর যে শ্রীনগর কাশ্মীরে বিদ্যমান, তা-ও আমি প্রমাণ দ্বারা সুসিদ্ধ করেছি। অতএব প্রতিবাদকারীগণ একথা বলতে আরও সুযোগ পান যে, বর্তমান ইঞ্জিলসমূহ প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মেরই এক প্রতিমূর্তি ও নকল মাত্র; এ প্রমাণসমূহের পরিমাণ এত অধিক যে, এটা গোপন রাখা অসম্ভব। আরও আশ্চর্যের বিষয় ইউযু আসফের পুরাতন ধর্ম গ্রন্থের সাথে (যা অধিকাংশ বিজ্ঞ ইংরাজ পন্ডিতের মতে যিশু খৃষ্টের জন্মের পূর্বেই লিখিত হয়েছিল ও যা বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে নানা দেশে প্রচারিত হয়েছে)। বাইবেলের অধিকাংশ কথায় এত সামঞ্জস্য আছে যে, বহু স্থানের বর্ণনাগুলোতে বাক্যসমূহ এর সাথে সম্পূর্ণ একরূপ। বাইবেলের বর্ণিত উপাখ্যানসমূহ অক্ষরে অক্ষরে উক্ত পুস্তকেও বর্ণিত আছে। মূর্খতায় কেউ অন্ধ প্রায় হলেও বিশ্বাস করবে যে, উক্ত পুস্তকের অবিকল বর্ণনাই অপহৃত হয়ে ইঞ্জিলে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করলে ইঞ্জিলের আর কিছুই বাকী থাকে না। নাউযুবিল্লাহ্, হযরত ঈসা তাঁর সমস্ত শিক্ষায় অপহরণকারী বলে প্রমাণিত হন। এ পুস্তক এখনও মজুদ আছে, কেউ ইচ্ছা করলে দেখতে পারেন। কিন্তু আমার মতে ইহা ঈসা (আঃ) এর ভারত ভ্রমণ লিখিত ইঞ্জিল ও অন্যান্য ইঞ্জিল অপেক্ষা সুরক্ষিত ও পবিত্র। কিন্তু কোন কোন ইংরেজ সুবিজ্ঞ মহাপণ্ডিত, একে বুদ্ধের প্রণীত পুস্তক বলে নির্দেশ করে নিজের পদে কুঠারাঘাত করেছেন। (চলবে)

অনুবাদ- মুহাম্মদ আজিম উদ্দীন আহমদ

চলিতকরণ ও সম্পাদনা - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাসহীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

মেহমানদারীর কতিপয় দিক

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৯ জুলাই, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহার পর সূরা হাশর-এর ১০ আয়াত পাঠ করে হুযূর (আইঃ) খুতবা এরশাদ করেন।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ এবং এ (মাল) তাদেরও জন্য যারা তাদের (হিজরতের) পূর্বে (মদীনায়) বাসগৃহে বসবাস করছিল এবং ঈমান এনেছিল তারা তাদেরকে ভালবাসে যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে, এবং তারা নিজেদের অন্তরে সেই সম্পদের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা বোধ করে না যা তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) দেয়া হয়, এবং নিজেদের দারিদ্র সত্ত্বেও তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়। এবং যাকে তার আত্মার কৃপণতা হতে রক্ষা করা হয়, তারাই বস্তুতপক্ষে সফলকাম। (সূরাতুল হাশর ঃ ১০)

আগামী জুমুআর দিন হতে এখানে ৩৬তম জলসা সালানা ইউ, কে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জলসাকে সামনে রেখে আজকের খুতবায় কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরবো (ইন্‌শাআল্লাহ্)।

হযরত শূরায় (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হুযূর নবীয়ে আকরম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন মেহ্মানকে সম্মান প্রদর্শন করে। এক দিন এক রাত মেহ্মানদারী করা তো তার পুরস্কার, কিন্তু তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করা কর্তব্য। তারপর যদি মেহমানদারী করা হয় তবে এটা তার পক্ষ থেকে সদকা হবে। কোন মেহমানের জন্য তিন দিনের বেশি অবস্থান করা উচিত নয় কারণ এতে করে মেযবানের (যার গৃহে মেহমান হয়েছে) কষ্ট হয় (আবূ দাউদ)।

হযরত উকবা বিন আমের বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যে মেহমানদারী করে না তার মধ্যে কোনই মঙ্গল ও কল্যাণ নেই (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, জান্নাতে কিছু বালাখানা (দোতালা ঘর) আছে যার ভেতর থেকে বাইরের অংশ দেখা যাবে এবং বাইরে থেকে ভেতরে দেখা যাবে। একজন বেদুঈন উঠে জিজ্ঞেস করলেন, কারা ঐ বালাখানায় থাকবে? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'যারা মিষ্ট

ভাষী, মেহমানদারী করে, রীতিমত নিয়মিত রোযা রাখে এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে রাতে মানুষ যখন ঘুমায় তখন তারা নামায পড়ে" (তিরমিযী)।

হযরত আবূ যর (রাঃ) বলেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "সামান্য পুণ্যকর্মকে তুচ্ছ মনে করবে না। তোমার ভাইয়ের সাথে তুমি যে হাসি মুখে কথা বল সেটাও পুণ্যকর্ম" (মুসলিম)।

একবার যখন মেহমানদারী সম্পর্কে কথা-বার্তা হচ্ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বললেন, "আমি সর্বদা স্মরণ রাখি, মনে রাখি যে, মেহমান যেন কষ্ট না পায়। এজন্য সর্বদা তাকিদ করতে থাকি যে, চেষ্টা কর মেহমানদের যেন আরাম ও সুবিধা করে দেয়া হয়। মেহমানদের মন কাঁচের মত হয়। খুব শীঘ্রই সামান্য চাপে ভেঙ্গে যায়। ইতিপূর্বে আমি ব্যবস্থা নিয়েছিলাম এবং নিজেও মেহমানদের সাথে খাবার খেতাম। কিন্তু পরিবর্তীতে অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকায় আমাকে স্বাস্থ্যগত কারণে রোগীর জন্য পথ্য জাতীয় খাবার খেতে হোত ফলে মেহমানদের সাথে খাওয়ার ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হয় নি। সাথে সাথে মেহমানদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং এত বেশি বৃদ্ধি পেয়ে গেল যে, আর স্থান সংকুলান সম্ভব হোল না। এভাবেই আমার পৃথক খাওয়ার ব্যবস্থা হোল। আমাদের পক্ষ থেকে অনুমোদন দেয়া আছে যার যা অসুবিধা থাকে সে যেন অসুবিধার কথা বলে কর্মচারীদের থেকে সুবিধা চেয়ে নেয়। অনেক সময় কারো অসুস্থতার কারণে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড, ২৯২পৃঃ)।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লঙ্গরখানা / মেহমানখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ডেকে তাকিদ করেছেন, "দেখ, অনেক সময় বেশি সংখ্যায় মেহমান এসে যায়, অনেককে তোমরা চেন, অনেককে চেন না, সুতরাং তোমাদের উচিত সবাইকে সম্মান প্রদর্শন করা, সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে তার মেহমানদারী করা। শীতের সময় হলে তা প্রদান কর, যেন কেউ কষ্ট না পায়। তোমাদের সম্পর্কে আমি সু-ধারণা রাখি যে, তোমরা মেহমানদের খেয়াল রাখ, আরাম দেবার চেষ্টা কর। সকল মেহমানের সেবা যত্ন কর। কারো ঘরে বা বাড়ীতে যদি শীতের কষ্ট হয় তবে সেখানে কয়লা বা কাঠ জ্বালিয়ে ঘর গরম করার ব্যবস্থা করে দাও" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৯২)।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লঙ্গর খানার কর্মকর্তাদের ডেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "আজকাল মৌসুম ভাল। যারা মেহমান এসেছেন তারা সবাই মেহমান। সকল মেহমানের যথাযথ সম্মানের সাথে সেবাযত্ন হওয়া উচিত। খাওয়া-দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা থাকা উচিত। যদি দুধ খেতে চায় তাকে দুধ, যদি কেউ চা খেতে চায় তাকে চা দিবে। যদি কেউ অসুস্থ হয় তবে তার চাহিদা মত খাবার তৈয়ার করবে" (ঐ পৃঃ ১৫, ১৬)।

একবার মেহমানদারী সম্পর্কে নসিহত করে বলেছিলেন, "লঙ্গরখানার কর্মচারী কর্মকর্তাদেরকে বারবার তাকিদ করা উচিত তারা যেন প্রত্যেকের সুযোগ-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখে। প্রধান ব্যবস্থাপক যিনি তিনি তো একা, অথচ কাজ অনেক বেশি। সুতরাং বাকী সবারই উচিত যদি তার কোন কথা স্মরণ না থাকে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া। কোন ব্যক্তির ময়লা কাপড় দেখে তার প্রতি যেন অবহেলা ও অনীহা প্রকাশ না করা হয়। কারণ মেহমান সকলেই মেহমান, সকলেই সমান। যদি কেউ নতুন অপরিচিত হয় তার প্রতিও পুরোপুরি নজর দেয়া, তার কী প্রয়োজন তার খোঁজ-খবর করা, যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করা আমাদের কর্তব্য। অনেক সময় দেখা যায় যে, একজন পেশাবের জায়গা বা গোসলখানা কোন্ দিকে তা জানে না, এবং সে ভীষণ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এ জন্য মেহমানের সকল অভাব-অভিযোগের প্রতি কড়া দৃষ্টি খুবই প্রয়োজন। আমি অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকি তাই অপারগ। কিন্তু যাদেরকে এসব কাজের দায়িত্ব দিয়ে আমার কায়েম মকাম (Acting বা স্থলাভিসিক্ত) করা হয়েছে তাদের জন্য একান্ত জরুরী, তারা যেন সজাগ দৃষ্টি রাখেন, কোন প্রকার অভিযোগ যেন সৃষ্টি হতে না দেন। কারণ মানুষ বহু দূর থেকে শতশত বা হাজারে হাজার মাইল দূর থেকে সত্যের সন্ধানে আসেন। এখানে এসেও যদি তারা কষ্ট পায় তবে তারা মনে আঘাত পেতে পারেন, অভিযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এবং তাদের জন্য ঈমানের পরীক্ষার কারণ হয়ে যেতে পারে এবং এজন্য মেযবান (অতিথি সেবক) গুনাহগার বা পাপের অংশীদার হয়ে যাবেন" (মলফূযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৭০)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"একথা সত্য যে, আল্লাহ্ পুণ্যকর্মকে বিফল করেন না- **ইন্নাল্লাহা লা ইউযিউ আজরাল মুহসিনীন** (অর্থাৎ আল্লাহ্ নিশ্চয় পুণ্যবানদের পুণ্যকে বিনষ্ট করেন না) কিন্তু সৎকর্মশীলদের দৃষ্টি তার ফলাফলের দিকে নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়। দেখ, মেহমান যদি কেবল এজন্য আসে যে, এখানে আসলে আরাম পাওয়া যায়, ঠান্ডা শরবত পাওয়া যায় তবে এটা তার জন্য ক্ষতির কারণ কিন্তু মেযবানের জন্য অবশ্যই মেহমানের সেবা যত্ন করা জরুরী। সেবা-যত্নে যেন কোন ত্রুটি না হয়" (আল্ হাকাম, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১০, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০১ইং)।

হযরত মহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সাহেব নিজ পিতা হযরত মৌলভী আনোয়ার হোসেইন খান (রাঃ)-এর আহমদীয়ত কবুলের ঘটনার এবং মেহমানদারীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,

আমার পিতা মরহুম আনোয়ার খান সাকিন শাহ্ আবাদ জেলা হরদোই, ইউপি, ১৮৮৯ইং সনে লুধিয়ানা এসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত করেছিলেন। পূর্বে কিছু পত্রালাপ হয়েছিল এবং বয়াত করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বয়াত গ্রহণের অনুমতি না থাকায় আমার আব্বাকে কাদিয়ান যেতে নিষেধ করে রেখেছিলেন। যখন হযরত (আঃ) এতদুদ্দেশ্যে লুধিয়ানায় আসলেন, আমার আব্বাকে খবর পাঠিয়েছিলেন। আব্বাজান খবর পেয়ে হুযূর (আঃ)-এর আদেশ পালনের জন্য লুধিয়ানা এসেছিলেন, এবং বরকতমন্ডিত হয়েছিলেন। আমার আব্বা দেওবন্দের পাগড়ী পরানো মৌলানা ছিলেন [মাদ্রাসা থেকে সম্মানের সাথে পাশ করলে কর্তৃপক্ষ এমন ছাত্রকে চূড়ান্ত সাফল্যের সনদের সাথে মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দিতেন - অনুবাদক] আব্বাজান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমানদারীর এ ঘটনা প্রায় শোনাতেন। "প্রথমবার আমি ১৮৯২ইং সনে কাদিয়ান এসেছিলাম। সে যুগে মেহমানগণ গোল কামরায় অবস্থান করতেন। আমিও সেখানে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। হযরত আকদস (আঃ)ও আমাদের সাথেই খাবার খেতেন। খাবার খেতে খেতে হুযূর প্রায়ই উঠে ভেতরে যেতেন এবং কখনও চাটনী, কখনও আচার নিয়ে আসতেন বলতেন, এটা আপনার খুব ভাল লাগবে। নিজে তো খুবই কম খেতেন কিন্তু মেহমানের খুব আপ্যায়ন করতেন" (রেজিষ্টার রেওয়ায়াত সাহাবা নং ৩, পৃঃ ১৩৪)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একবার সকলকে সম্বোধন করে বললেন, "মানুষের সংখ্যা যেহেতু অনেক বেশি হতে পারে কোন মেহমানের কোন বিশেষ প্রয়োজন কর্মচারীরা জানতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত যার যা প্রয়োজন সে যেন নির্দ্বিধায় বলে দেয় যে, তার কী প্রয়োজন। যদি কেউ গোপন করে রাখে তবে তার গুনাহ্ হবে। আমার জামাতের মৌলিক নীতি এই যে, স্পষ্ট কথা অকপটে বলে দেয়া বা সহজ সহজ অনাড়ম্বর অকপট অকৃত্রিম অভিব্যক্তি" (মলফূযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৭৯)।

একদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মুন্সী আব্দুল হক সাহেবকে বললেন, "আপনি আমাদের মেহমান, সে মেহমান আরাম পেতে পারে যে অকৃত্রিম ও অকপটে সব প্রয়োজন ব্যক্ত করে কোন প্রকার কৃত্রিমতা বা লৌকিকতা না করে। সুতরাং আপনি যা প্রয়োজন অতি সহজে নির্দ্বিধায় বলে দেবেন। তারপর জামাতকে সম্বোধন করে বললেন, "দেখুন ইনি আমাদের মেহমান, তাঁর সাথে তোমাদের সকলের ভদ্রভাবে সহৃদয় আচরণ করা উচিত এবং চেষ্টা করা যেন উচিত যেন তাঁর কোন প্রকার অসুবিধা না হয়" (মলফূযাত; ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৮০)।

হযরত আকদস (আঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মনে করে যে, তার এখানে আসাতে তার উপর বোঝা পড়ে অথবা এখানে তার আসাতে আমাদের উপর বোঝা পড়ে- তার জন্য বড় ভয়ের কারণ। তার ভয় পাওয়া উচিত যে, সে শির্ক-এ লিপ্ত আছে। আমার তো বিশ্বাস এই যে, সমস্ত পৃথিবীর মানুষও যদি আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যায় আল্লাহ্তাআলা আমাদের সমস্ত কর্মকান্ডের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করবেন। আমাদের উপর সামান্য বোঝাও চাপ পড়ে না। বন্ধুদের আগমনে তো আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করি। কারো মনে এমন ধারণা হয় এটা তাদের অলীক কল্পনা। এমন ধারণাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়া উচিত" (মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৫৫)।

এবার সমাগত জলসা সম্পর্কে কয়েকটি কথা মেযবান ও মেহমানদের নসীহতস্বরূপ বলতে চাই।

ইংল্যান্ডের আহমদীদের উচিত বড় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে জলসায় যোগ দান করা। কোন বিশেষ কারণ ছাড়া যেন কেউ অনুপস্থিত না থাকে। কোন কোন ব্যক্তি তিন দিনের বদলে ২/১ দিনের জন্য এসে যোগদান করে। অথবা শেষ দিন এসে যোগ দেয়। তাদের আসার উদ্দেশ্য কেবল দেখা সাক্ষাৎ করা। এ জলসার কল্যাণসমূহ হাসেল যদি কেউ করতে চায় তবে তার উচিত জলসার উদ্দেশ্যসমূহকে সমানে রেখে তিন দিনের জন্য এখানে এসে হাজির হওয়া। যতদূর সম্ভব, বক্তৃতামালাও অন্যান্য

প্রোগ্রামগুলোতে উপস্থিত থাকা এবং মনোযোগ দিয়ে শোনা। সময়ের মূল্য বুঝে কোন সময়কে নষ্ট না করা।

মেহমানদের সম্মানপ্রদর্শন ও তাদের খেদমত করাকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা। ভালবাসা, আন্তরিকতা, ত্যাগ, কুরবানী, করার সদিচ্ছা নিয়ে তাদের সেবা করা।স্মরণ রাখবেন, মেহমানদারী যদিও তিনদিন, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনরা যদি কিছু বেশি দিন তাদেরকে রাখেন তবে সেটা কখনও মেহ্মানদারী হবে না বরং এটা আত্মীয়তার দাবী।

যদি মেহমানরা তাদের পসন্দ ও সুবিধামত থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা না পান তবে তারা যেন যা পেয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। কেউ ব্যবস্থাপনার কোথাও যদি কোন ত্রুটি দেখে তবে সেটা যেন এখানে সেখানে খুব প্রচার না করে। হ্যাঁ, যারা দায়িত্বে আছেন তাদেরকে দ্রুত অবগত করাবেন যেন যতদূর সম্ভব ত্রুটি দূর করার ব্যবস্থা তারা নিতে পারেন।

জলসার দিনগুলোতে বিশেষ করে যিক্‌রে ইলাহীতে রত থাকুন। দুরূদ শরীফ পড়তে থাকুন। যথাসময়ে যত্ন সহকারে নামায আদায় করুন। লঙ্গর খানাতেও যেন নামাযের সুব্যবস্থা থাকে। সমস্ত কর্মরত ব্যক্তিরা বিনা ব্যতিক্রমে নামায আদায় করবেন। বিভাগের দায়িত্বে যারা আছেন তারা এটা নেগরানী করবেন।

বাজে কথা-বার্তা বলা থেকে বিরত থাকবেন। পরস্পর কথাবলার সময় আস্তে কথা বলবেন। ভদ্রতা রক্ষা করে কথা বলবেন। কর্কশ ভাষার ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। উচ্চস্বরে তুই তোকারী করে কথা বলা, দল বেঁধে বসে অট্ট - হাসি করা ভাল অভ্যাস নয়। এমতাবস্থায় কারো মনে ধারণা আসতে পারে যে, হয়ত তাকে উদ্দেশ্য করে হাসাহাসি করা হচ্ছে।

নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার (না'রা) কেবল ষ্টেজ থেকে নির্ধারিত ব্যক্তি বলবেন, বিশৃঙ্খলভাবে চিৎকার হতে থাকা উচিত নয়। সর্বত্র সর্বক্ষণ শৃঙ্খলা ও নিয়ম মান্য করে চলতে হবে। সকল কর্মকর্তা ও জলসার ব্যবস্থাপনার সাথে সহযোগিতা করবেন। আনুগত্য করবেন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। অতএব পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। জলসা গাহ্, মসজিদসমূহ, আবাসিক স্থানসমূহ সর্বত্র পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করবেন। পুরো পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে ব্যবস্থাপকদের সাহায্য করবেন। গোসলখানাগুলোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও একান্ত আবশ্যক। বিভিন্ন স্থানে আবর্জনা রাখার যে ডাস্টবিন রাখা আছে সেগুলো ব্যবহার করবেন। খাওয়ার পরে যে থালা-বাটি ফেলে দেবার যোগ্য সেগুলো যথাস্থানে ফেলে দিবেন। স্মরণ রাখবেন খাদ্য-দ্রব্য যেন এক মুঠও বিনষ্ট না করা হয়। যতটা খাবার নিজ প্লেটে নেয়া প্রয়োজন ততটাই নিবেন যেন নষ্ট না হয়। প্রয়োজনে আবার নিতে পারেন।

মহিলারা পর্দার খেয়াল রাখবেন। যাদের বিশেষ কারণে মুখ ঢাকতে কষ্ট হয় তারা মেকআপ করে ঘুরে বেড়াবেন না। সকল অবস্থায় মহিলা-পুরুষ সকলেই দৃষ্টি নীচে রাখবেন।

ইসলামাবাদে প্রবেশের সময় যে চেকিং ব্যবস্থা নিরাপত্তার খাতিরে গ্রহণ করা হয়েছে তার সাথে স্বয়ং সহযোগিতা করবেন। নিজেকে চেক করাবেন। এ রকম না যেন হয় যে, আপনাকে জোর করে চেক করতে হচ্ছে। সর্বক্ষণ পরিচয় পত্র (কার্ড) সাথে লাগিয়ে রাখবেন। যদি কেউ উক্ত কার্ড ঝুলিয়ে না রাখে তাকে নম্রতার সাথে বুঝাতে হবে।

নিরাপত্তার কথা সর্বদা স্মরণ রাখবেন। সকলেই নিজ নিজ স্থানে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন; কিন্তু চুপচাপ। কোন অজ্ঞাত অবিচ্ছেদ্য ব্যক্তিকে দেখলে নিরাপত্তা কর্মীদের অবহিত করবেন। নিজেই জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করবেন না।

গাড়ী পার্কিং নির্ধারিত স্থানে যেন হয়, অন্যের দরজা বা পথ রোধ করে যেন গাড়ী না রেখে যান। যানবাহন চলাচলের বিধান বা ট্রাফিক রুল্‌স (নিয়ম-কানুন) মান্য করে চলবেন। জলসাগাহে পার্কিং কর্মচারীর সাথে সহযোগিতা করুন। এ দেশে থাকাকালে এদেশের বিধান, রীতিনীতি মেনে চলবেন। ভিসা শেষ হবার পূর্বে এ দেশ ত্যাগ করুন।

রাস্তা সম্পর্কে কর্তব্য পালন করবেন। রাস্তায় কোন কষ্টদায়ক জিনিস পড়ে থাকলে তা সরিয়ে দিবেন। কোন কিছু পড়ে থাকা বস্তুকে সরানোও একটি পুণ্যকর্ম। জলসার কার্যক্রম চলাকালে বাজার বন্ধ থাকা উচিত। যদি বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে তবে মাত্র অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা যেতে পারে। নিজেদের মূল্যবান জিনিস, নগদ টাকা ইত্যাদিকে সংরক্ষণ করবেন, হেফাযত করবেন। কোন অবস্থাতেই কারো কাছে টাকা ঋণ চাইবেন না। সবচেয়ে জরুরী বিষয় এই যে, এ জলসাকে কোনক্রমে জাগতিক মেলা মনে করবেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, এ জলসাকে জাগতিক মেলার মত মনে করে সে রকম প্রস্তুতি যেন গ্রহণ করা না হয়। বরং এ জলসার আয়োজন কেবল পবিত্র ধর্মীয় নিয়্যতে যেন করা হয় এবং অত্যন্ত মঙ্গলজনক সুফলের ভিত্তিতে। হুযূর (আঃ) আরো বলেছেন, "এ জলসা কোন জাগতিক খেলাধূলা বা রঙ্গ-তামাশার মত তামাশা নয়" (মজমুআ ইশতিহারাত, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৪০)।

জলসায় যারা এসে অংশগ্রহণ করেন তাদের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেসব দোয়া করেছেন তার কিছুটা পড়ে আজকের খুতবা শেষ করছি। হুযূর (আঃ) আল্লাহ্‌র কাছে আরয করেছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি যে কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে এ জলসায় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সফরে যাত্রা করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গী হোন, তিনি তাদেরকে অনেক বড় পুরস্কার প্রদান করুন। তাদের প্রতি করুণা করুন, তাদের প্রত্যেক কষ্ট থেকে উদ্ধার করুন, তাদের উদ্বিগতা দূর করে বিষয়গুলো সহজ করে দিন। তাদের উদ্দেশ্যসমূহকে পাওয়ার রাস্তাগুলোকে তাদের জন্য খুলে দিন এবং রোজ হাশরের দিন তাদেরকে নিজ বান্দাদের সাথে উঠান যাদের উপর তাঁর ফযল ও রহম আছে। তারা এ সফর থেকে ফেরত পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের পেছনে যারা আছে তাদের দেখা-শোনা করেন।

হে আল্লাহ্, বুযূর্গ খোদা, দানশীল খোদা, দয়াময় ও দুঃখের আশ্রয়কারী খোদা! আমার এ সমস্ত দোয়া কবুল কর। আমাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে বড় উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দ্বারা আমাদিগকে বিজয় দান কর, প্রত্যেক শক্তি ও ক্ষমতা কেবল তোমারই আছে।' আমীন সুম্মা আমীন।" (ইশতিহার, ৭ ডিসেম্বর, ১৮৯২ইং) (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ২৩ আগষ্ট, ২০০২ইং)

অনুবাদ- মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(২৩-০৪-০২ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত ও অনূদিত)
(জনাব আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারেক অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করেন)

প্রশ্ন নং ১ ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম সম্পর্কে যে নিদর্শন আছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্ম সম্বন্ধেও কি এ রকম কোন নিদর্শন আছে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যতদূর আমি জানি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্ম সম্বন্ধে আল্লাহ্তাআলা ঐ ধরনের কোনো নিদর্শনের কথা বলেন নি। তবে তাঁর (আঃ) জন্মের আগে এক জময বোন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি পরে মারা যান। ঈসা (আঃ) জন্মের একটা গুরুত্ব বহন করে কিন্তু মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্মের সময় এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই।

প্রশ্ন নং ২ ঃ সাধারণতঃ ইংল্যান্ডে এবং বাংলাদেশেও মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করছে কিন্তু এর ফলে বিয়ে-শাদীর সময় কিছু সমস্যাও সৃষ্টি হচ্ছে। হুযূর এ সম্বন্ধে কী মনে করেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে এটাকে কোনো বড় সমস্যা মনে করা উচিত নয়। পাত্র যেন পরিষ্কারভাবে পাত্রীর গুরুজনদের বলে, "আমি যদিও পাত্রীর তুলনায় কম লেখাপড়া করেছি তবুও আমি পাত্রীকে বিয়ে করতে আগ্রহী এবং আমি তার স্বামী হিসাবে আমার সব দায়িত্ব পালন করতে সদা প্রস্তুত থাকবো।" এটাই সহজ সমাধান।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ আগ্রা শহরে বিখ্যাত 'তাজমহল' নির্মাণে বিশ হাজার লোক বাইস বৎসর কাজ করেছিল এটা কি সত্যি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা খুবই সম্ভব এবং অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই। আপনি হয়তো নিজে 'তাজমহল' দেখেন নি। যদি আপনি তাজমহলের বিশালতা ও মনোরম সৌন্দর্য নিজের চোখে দেখতেন তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন যে, অত বড় ও সুন্দর একটি সৌধ নির্মাণ করতে হাজার হাজার লোককে নিশ্চয়ই বহু বছর ধরে কাজ করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ কুরআন শরীফে সূরাতু বনী ইসরাইলের ১১২ আয়াতে বলা হয়েছে "এবং দুর্বলতার কারণে কেউ বন্ধু হতে পারে না।" দয়া করে এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্তাআলা মহান। তিনি এমন লোককে পসন্দ করেন, যে সত্যি সত্যি শ্রদ্ধার পাত্র। আল্লাহ্তাআলা অনুগ্রহ করেই কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ সাধারণতঃ শিশুদের বিশেষ করে যুবকদের পড়ার ব্যাপারে দুর্বলতা দেখা যায়। তাদেরকে নামায পড়াবার ব্যাপারে কী কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ তাদের বার বার স্মরণ করাতে হবে। তাদেরকে তাহাজ্জুদে যদি উঠানো যায় তাহলে তাদের মধ্যে ফজরে উঠার অভ্যাস সৃষ্টি হবে।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ যদি কোন আহমদী এক শহরে একাই থাকেন তো তার জুমুআর দিন জুমুআর নামায পড়া সম্ভব হয় না। তখন তার কী করা উচিত?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সে ব্যক্তি কত দূরে থাকে। যদি দূরত্ব অনেক বেশি হয় তাহলে তার ঠিক সময় নিজে আযান দিয়ে নিজ গৃহে একা একাই জুমুআর নামায আদায় করতে হবে। আল্লাহ্র ফিরিশ্তাগণ তার সংগে নামাযে শামিল হবেন। এটাই হচ্ছে আমাদের মহানবী (সঃ)-এর কথা।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ চাকুরীস্থল ও পিতামাতার বাসা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। এসব স্থানে নামায কসর হবে কি না?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ বাবা-মায়ের বাড়ীতে ছেলে-মেয়েরা গেলে নামায কসর করবেন না। কেননা, সেটা তাদের বাড়ী। অপরপক্ষে সন্তানদের বাড়ীতে যদি পিতা-মাতা যান তারা নামায কসর করবেন।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ কেউ যদি জামাতের দায়িত্ব পান আর নিজেকে রূহানী দিক থেকে দুর্বল মনে করেন, তাহলে তার কি সেই দায়িত্ব পালন করা উচিত?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ তিনি একটি না-সূচক অনুরোধ জানাতে পারেন। এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া দরকার যে, অন্যেরা তার নিযুক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারেন না যে, তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তাদের অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে আর এটা রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নির্দেশ।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ সূরা আম্বিয়া ৮ আয়াতে আছে- "এবং আমরা তোমার পূর্বেও কেবল পুরুষগণকেই (রসূলরূপে) পাঠিয়েছি যাদের প্রতি আমরা ওহী করতাম। সুতরাং যদি তোমরা না জেনে থাক তা হলে আহলে যিক্রকে (পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবের অনুগামী)। জিজ্ঞেস করে দেখ খৃষ্টানরা অনেক সময় উক্ত আয়াতের আলোকে বলে থাকেন যে, মুসলমানদেরকে আমাদের নিকট থেকে জিজ্ঞেস করে নিতে বলা হয়েছে। এর উত্তর কীভাবে দেয়া যায়।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আসল ব্যাপার হলো আহলে যিক্র দ্বারা খৃষ্টান ইহুদীদের দিকে ইঙ্গিত করে না। এতদ্ দ্বারা বুদ্ধিমান লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। যারা আল্লাহ্র যিক্রে নিবদ্ধ থাকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ মাছ কী খায়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ বড় মাছ ছোট মাছ খায়। তারা সাগরের প্রটোজোয়া নামক ঘাস খায়। এগুলো খুবই পুষ্টিকর। এতে

অনেক খাদ্য প্রাণ ও আমিষ রয়েছে। সকল মাছই এগুলো খেয়ে থাকে।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ প্রথম বয়াত যে ঘরে হয়েছিলো সে ঘরের অবস্থা কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা জামাতের অধিকারে রয়েছে এবং ভালভাবে সংরক্ষিত আছে।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ তিমি মাছ বাচ্চা দেয় ডিম দেয় না কেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ বলা হয় পূর্বকালে তিমি মাছ স্থলভাগের প্রাণী ছিলো। পরে পানিতে বাস করা আরম্ভ করে। আর তাই তিমি মাছ ডিম না দিয়ে বাচ্চা দিয়ে থাকে। বড় তিমি বিশাল আকারের প্রাণী। তিমির একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে- তিমির লেজ ওপরে নীচে নাড়িয়ে থাকে। আর সব মাছ ডানে বামে নাড়িয়ে থাকে। তিমি মাছের লেজের এত শক্তি যে, একটি রেল ইঞ্জিন উল্টিয়ে ফেলতে পারে। এটা একটি অকল্পনীয় বিষয়।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খলীফাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীন বলা যায় কিনা?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খলীফাগণকে খুলাফায়ে রাশেদীন আখ্যা দেয়া মোটেই ঠিক হবে না। খুলাফায়ে রাশেদীন এমন একটি উপাধি যা কেবল মাত্র মহানবী (সঃ)-এর চার (৪) খলীফা [অর্থাৎ হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত আলী ও হযরত উসমান (রাঃ)-]এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ কোন ব্যক্তির দৈনন্দিন চাল-চলনের দ্বারা যদি বুঝা যায় যে, তিনি যে বাজেট লিখিয়েছেন তার চেয়ে তার আয় বেশি। সুতরাং এক্ষেত্রে তাকে কীভাবে বুঝানো যেতে পারে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ কেবল বুঝানোই যেতে পারে। কুরআন অনুযায়ী বলা যায়। কাউকে তো দারোগা বানানো হয় নি। সুতরাং তাদেরকে বার বার স্মরণ করানো ছাড়া আর কোন পদ্ধতি নেই।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ খৃষ্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বীর সমাধি ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কবর স্থানে যাওয়ার দোয়া পড়া যায় কিনা?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না, মনে হয় সেটা ঠিক হবে না।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ ফিরিশ্‌তা বা মালায়েকা কি জড় বস্তুর জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না, ফিরিশ্‌তা শব্দ জড় বস্তুর জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। (এরপর একটি নযম পাঠ করা হয়)

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ 'ইশার নামাযের আগে ঘুম পেলে কি করা যায়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ ঘুম ঝেড়ে ফেলতে হবে। নামাযের পরে রাতের খাবার খেলে ক্লান্তি কম আসবে এবং নামাযের আগে ঘুম আসবে না।

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ গরমের দিন ভাল না শীতের দিন ভাল?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ উভয় দিনেই সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। গরমের দিনে দিন বড় হয় ও রাত ছোট হয় তেমনিভাবে শীতের দিনে এর উল্টোটা রাত অনেক বড় দিন অনেক ছোট। রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়ালে রাত শেষ হতে চায় না। এভাবে শীত ও গ্রীষ্মের উভয়েরই ভাল মন্দ দুটো দিকই রয়েছে।

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ কুরআন শরীফের সূরা গাশিয়ার ১৮ আয়াতে আছে ঃ "তারা কি উটগুলোর দিকে লক্ষ্য করে না যে, ওগুলোকে কীরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে? হুযূর দয়া করে এ আয়াতটি আরও একটু বিষদ ব্যাখ্যা করুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সত্যিই উট এক অসাধারণ বৈশিষ্টসম্পন্ন যা পানি না খেয়েও মরুভূমিতে একটানা ৩০ মাইল দীর্ঘ সফর করতে পারে। তার পিঠে যেই জায়গাটা উঁচু ওখানে অনেক পরিমাণে চর্বি জমা থাকে। এ চর্বি ক্রমশঃ গলতে থাকে এবং উটকে শক্তি সরবরাহ করে। প্রচন্ড তাপ ও গরম আবহাওয়া সহ্য করতে পারে। উটের পায়ের গঠনটা এমন যে মাটির সংস্পর্শে আসলেও বালুর ভিতরে দেবে যায় না। আবার যখন পানি পাওয়া যায় তখন উট এক সাথেই খুব বেশি পরিমাণ এমন কি মন মন পানি একবারে পান করে নিতে সক্ষম। এছাড়া আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা খামাখা উটের উদাহরণ দেন নি।

প্রশ্ন নং ২০ ঃ আজকাল ইউরোপে উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন খুব বিস্তার লাভ করছে এর কারণ কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা ঠিক যে, আজকাল অনেক দেশে এবং অনেক অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলছে। এটা বৃটেনের শান্তি নষ্ট করতে যাচ্ছে। তারা নাৎসীবাদের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। তবে তারা আগে বাড়তে পারছে না। এমন কি নির্বাচনে তারা একটি সীটও পায় নি। ফলে তারা এখনও আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌছে নি।

প্রশ্ন নং ২১ ঃ সূরা আন্‌কাবূতের ৪২ আয়াতে এ আছে ঃ "নিশ্চয় সকল ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সর্বাধিক দুর্বল"। দয়া করে এ বিষয়ে কিছু বলুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সত্যিই মাকড়সার ঘর সর্বাধিক দুর্বল। অথচ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জানিয়েছেন যে, মাকড়সা যে আঁশ (Fibre) দিয়ে নিজের ঘর বানায় সেই আঁশ এতই মজবুত হয় যে, ইস্পাতকেও হার মানায়। তা হলে কী হবে মাকড়সা সেই আঁশ দিয়ে জাল বুনে যাকে ইংরেজীতে Web বলা হয় তো সেই মাকড়সার জাল এক আঘাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কত অসাধারণ জিনিস দিয়ে কত দুর্বল ঘর বানানো হয়েছে এটাই একটি আশ্চর্য বিষয়।

প্রশ্ন নং ২২ ঃ কোন এক ব্যক্তিকে খুন করার জন্য যদি কেউ তাকে খুঁজে আর তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে সে কোথায় তা হলে জানা থাকলেও সে ব্যক্তির প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মিথ্যা বলা যাবে কিনা?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এখানে সত্য বা মিথ্যা কোনটাই বলা যাবে না। বলতে হবে আমি বলবো না। কোন অবস্থায়ই মিথ্যা বলার অনুমতি নেই।

সংকলন ও অনুবাদ -নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

পর্ব ২ ঃ
অধ্যায় ঃ ১
(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

হিন্দু মতবাদ

এ পর্বে আমরা এমন কিছু ব্যবস্থা নিয়ে আলাপ করতে চাই, যা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভুলবশতঃ খোদাহীন দর্শন বা প্রতিমা পূজারী ধর্ম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করার বিষয়টি নিয়েও কিছুটা আলোচনা করবো। কেননা, এর সঠিক প্রকৃতি ও পটভূমি সম্পর্কে মনে হয় সংশ্লিষ্ট ধর্মগুলোর অনুসারীদের মধ্যেও যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে। অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, কনফুসীয়সী মতবাদ, তাও মতবাদ (Taoism) এবং যরথুস্ত্রের শিক্ষা (Zoroastrianism)।

তবে প্রথমেই আসে হিন্দু ধর্মের কথা। ধর্ম জগতে হিন্দু ধর্ম নিজেই একটি আলাদা ধারা তৈরী করেছে। কিন্তু প্রচলিত যে হিন্দু ধর্ম, তার মধ্যে ওহী বা ঐশীবাণীর সাক্ষ্য প্রমাণ খুঁজে বের করা খুবই কঠিন কাজ। কেননা, একদিকে বলা হচ্ছে যে, ঐশী বাণীর ধারা বেদের শিক্ষা-সমূহের মধ্যেই সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত। আবার অন্যদিকে বলা হচ্ছে যে, খোদা বা ঈশ্বর যুগে যুগে মানুষকে শিক্ষা দিতে নিজেই মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় তাদের এ ধারণা দুটোই পরস্পর বিরোধী ব্যাপার বলে মনে হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু ধর্মের অবতার কৃষ্ণ এবং খ্রীষ্ট ধর্ম প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে একটা ভাসাভাসা সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন, যীশু ঈশ্বর পুত্র, মানুষের মুক্তির জন্য পিতা ঈশ্বর কর্তৃক পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে প্রেরিত হন। তবে বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ ভার পিতা ঈশ্বরের নিকট ছিল বলেই প্রতিপন্ন হয়। তদুপরি রয়েছে পবিত্রাত্মা, যিনি পিতা ঈশ্বর বা পুত্র যীশু কোনটিই নন, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। হিন্দু ধর্মের মধ্যেও তেমনি ঈশ্বরের বিকাশ বা মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হওয়ার বিষয় পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মর বিকাশ, মানুষ অবতাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু এ কথটি স্পষ্ট নয় যা, কৃষ্ণের আবির্ভাবকালীন সময়ে ব্রহ্মর ভূমিকা কি ছিল? স্বর্গ থেকে ব্রহ্মই কি তখন এ বিশ্বকে পরিচালনা করেছেন, না কি মানবরূপী কৃষ্ণই ছিলেন তখন

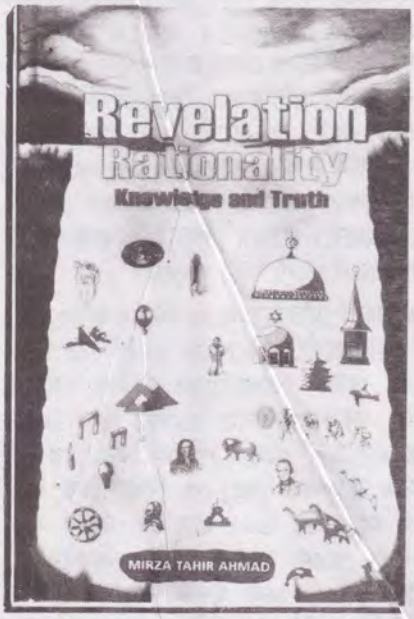

এ বিশ্বের নিয়ন্তা? অথবা কৃষ্ণ ছিলেন ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি মাত্র, বিশ্বজগৎ পরিচালনার ভার বরাবর ব্রহ্মর হাতেই সমর্পিত ছিল? এ জাতীয় কিছু প্রশ্নের উত্তর কিন্তু হিন্দু ধর্মের আলোকে পাওয়া যায় না। আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে এই জাতীয় কিছু বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করার বিষয়ে আমরা সচেষ্ট হব।

এ পর্যায়ে ঐশী-বাণীর ব্যাপারটা পুনরায় উল্লেখ করছি। খ্রীষ্ট ধর্মের বিশ্বাস এ ব্যাপারে অন্যান্য প্রচলিত ধর্মগুলোর অনুরূপ যে ঐশীবাণী সতত স্বর্গ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস ভিন্নতর। তাদের মতে যেহেতু ঈশ্বর মানুষরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হচ্ছেন, সেখানে তার তো ঐশী-বাণীর জন্য আলাদা কোন বাহকের দরকার নেই। হিন্দু ধর্মের আরেকটি বিষয় হচ্ছে বেদ ও তার প্রাপক প্রাচীন ঋষিগণের প্রশ্ন। বলা হয়ে থাকে যে, বেদ হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী। কিন্তু এই বেদ যে সমস্ত ঋষির নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল, তার পদ্ধতি নিয়ে এখানো রয়েছে নানা সংশয়। এটা এখনো স্পষ্ট নয় যে, ঋষিরা এটা ঐশীবাণী হিসাবে পেয়েছিলেন না এগুলো কোন অনুপ্রেরণা বা ভাবনা চিন্তার ফলে তৈরী হয়েছিল। এ ব্যাপারে যথেষ্ট বাদানুবাদ থাকলেও একটি ব্যাপারে সকলেই একমত যে ঋষিরাই হচ্ছেন সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন।

ঋষি সম্পর্কে হিন্দুদের যে ব্যাখ্যা তা হলো-এই যে, তারা হলেন স্বর্গীয়, পূত-পবিত্র লোক যারা বাহ্যিক পৃথিবীর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেদেরকে ন্যস্ত করেছিলেন। তবে ঋষিরাই পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন ও আদি মানব কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। নৃ-তাত্ত্বিক দিক থেকে এ নিয়ে গবেষণা হতে পারে। আমরা শুধু বলবো যে, হিন্দু ধর্ম একটি প্রাচীন ধর্ম, এবং এর অধিকাংশ বিশ্বাস কল্পনা, এবং নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা বা অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে তৈরী করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, আমরা এ কথাও বলবো যে, ওই সব ঋষির মধ্যে হয়ত কেউ কেউ ছিলেন যুগের অবতার বা নবী যাদের নিকট আল্লাহ্ ঐশী বাণী প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সচরাচর এটাই হয়ে থাকে যে, যুগ সংক্রান্তির ফলে নবীদের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ পরবর্তীতে অনেকটা বিকৃত হয়ে পড়ে এবং এটাও বিচিত্র নয় যে, হিন্দু ধর্মের বেলায়ও তমনটি ঘটেছিল। তাই বেদ, যা হিন্দুদের মতে আল্লাহ্র বাণী, তার মধ্যে পরবর্তীতে বিবৃতি বা পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। তবে ঐশী-বাণীর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তাকে যতই বিকৃত করা হোক না কেন, তার মধ্যে কিছু অংশ অবশ্যই অবিকৃত থাকে, যাকে ভিত্তি করে প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করতে হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেক যদি আমরা হিন্দু ধর্মের সন্ধান করি তা হলে দেখা যাবে যে, হিন্দু ধর্মের উৎস ও মৌলিক শিক্ষা অন্যান্য ঐশী ধর্মের থেকে খুব একটা আলাদা নয়। এটা অনেকটা সেই রঙিন কাঁচের নলের ভিতর দিয়ে কেলিডোস্কোপের (Kaleidoscope) দৃশ্য অবলোকন করার ঘটনার মত যে, নলটা একটু ঘোরালেই সম্পূর্ণ অন্য চিত্র সামনে এসে উপস্থিত হয়।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এখন যদি আমরা মহাভারতের এবং ভাগবত গীতা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ কখনো নিজের প্রতি ঈশ্বরত্ব বা অনশ্বর হওয়ার দাবী করেন নি। বরং তিনি ছিলেন অন্য একজন নবীর মতই যারা তার পূর্বে বা পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বিশ্বস্ত জীবনচরিত রচনাকারীদের মতে আনুমানিক ১৪৫৮ খ্রীষ্ট-পূর্বে কৃষ্ণের জন্ম হয়। অন্যান্য সাধারণ মানব শিশুর মতই পিতা বাসুদেবের ঔরসে এবং মা দেবকীর গর্ভে তিনি

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল কানাই (কিনাই / কিনহাই)। আলোকিত মানুষ বা অন্ধকার দূরীভূতকারী অর্থে পরবর্তীতে তিনি কৃষ্ণ নাম প্রাপ্ত হন।

সাধারণ মানব শিশুর মতই কৃষ্ণ বড় হতে থাকেন, এবং বিভিন্ন ঘটনায় তার মানবিক গুণাবলীই প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন, ছেলে মানুষী করে ছোটকালে ১ বা ২ কিলো মাখন চুরি করার (ননীচোর হিসাবে হিন্দুশাস্ত্রে যার উল্লেখ আছে) প্রসঙ্গ। আমরা বিশ্বাস করি কৃষ্ণের উক্ত কর্ম তাঁর বয়সের বিবেচনায় খুব একটা অপরাধের মধ্যে পড়ে না, বরং যারা হৃদয়বান শিশু, অনেক সময় তারা তাদের অন্যান্য বন্ধুদের পরিবেশনের জন্য, বিশেষ করে যারা গরীব, তাদের আপ্যায়নের জন্য গোপনে নিজ বাড়ী থেকে এ জাতীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করে। এ ধরনের কাজের জন্য তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা হয় না, বরং ভালবাসার অনুভূতি দিয়ে দেখা হয়। তেমনি যুবক বয়সে কৃষ্ণ বীরত্ব ও নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে প্রসিদ্ধি পান। যদিও এসব কর্মকান্ডই ছিল মানবিক, কিন্তু অতিভক্তি ও অতিরঞ্জনের ফলে তাঁর সম্পর্কে অনেক অতি মানবিক (supernatural) কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে (যা প্রায়শই অন্যান্য অনেক নবী রসূলের অনুসারীরা তাদের ধর্মগুরু সম্পর্কে বর্ণনা করে থাকেন)। আসলে কৃষ্ণ ছিলেন ভারতের একজন মহান আধ্যাত্মিক শিক্ষক এবং একজন সংস্কারক হিসাবেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তাঁর সমাজের মানুষজনকে পুণ্য অর্জন ও পাপ পরিহার করার কথা বলেছেন। অবশ্য যেসব পাপাচারী ব্যক্তি ধর্মকে নির্মূল করে খোদাহীনতার প্রসার ঘটাতে চেয়েছেন, তাদেরকে হত্যা করে সমাজের নিরাপত্তা প্রদান করাকে তিনি পুণ্য কাজ বলে বর্ণনা করেছেন।

কৃষ্ণের বাহ্যিক অবয়ব বর্ণনায় আমরা কিছু অদ্ভুত বিষয়ের উল্লেখ দেখতে পাই। যেমন, অনেক হিন্দু দু'টি হাতের পরিবর্তে চার হাত বিশিষ্ট এবং ডানা সহকারে কৃষ্ণের ছবি এঁকেছেন। আবার কিছু ছবিতে বাঁশী ঠোঁটে লাগিয়ে কৃষ্ণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আবার একদল লাবণ্যময়ী কুমারী নারী, যারা বিচিত্র সব পোষাকে সজ্জিত কৃষ্ণকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে- এমন ছবিও চোখে পড়ে। এসব মেয়েদেরকে গোপী (Gopi) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, কোন কাজ বা ভাব প্রকাশে অনেক সময় রূপকের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গোপী তেমনি একটি রূপক শব্দ। গোপী হচ্ছে এমন সব মহিলা যারা গরু লালন-পালন করে। বলা প্রয়োজন যে, স্বয়ং কৃষ্ণের একটি পদবী ছিল গোপাল, অর্থাৎ গরু লালন-পালনকারী। বাইবেলে অনেক ইসরাঈলী নবীদের যেমন মেষপালক বা রাখাল (shepherds) বলা হয়েছে, ঠিক তেমনি ভারতে যেহেতু মেষের পরিবর্তে বেশি গরু পালিত হতো, তাই সাধারণ মানুষকে রূপকভাবে গো এবং কৃষ্ণকে তাদের নেতা হিসাবে গোপাল বলা হয়েছে। কৃষ্ণের অনুসারীদেরকেও তাই রূপক অর্থে গোপী বলা হয়েছে।

একইভাবে কৃষ্ণের অন্যান্য বর্ণনাও রূপকধর্মী। তা সেই অর্থেই এগুলোকে ব্যাখ্যা করে নিতে হবে। যেমন, আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত লোকদের ডানা সম্বলিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন শরীফে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর রহমতের ডানা প্রসারিত করার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। একইভাবে, ফিরিশ্তাদের ডানা মূলত তাদের গুণ বা বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, বাহ্যিক কোন ডানা নয়।

তেমনি কৃষ্ণকে মুরলীধর বা বাঁশী ঠোঁটে চিন্তা করার বিষয়টিও ব্যাখ্যা যোগ্য। বাঁশী এখানে মূলত ওহী বা ঐশীবাণীর প্রতীক হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। বাঁশীতে যে সুর ধ্বনিত হয়, তা যেমন বাঁশির নিজের নয়, বাঁশিওয়ালার, তেমনি কৃষ্ণের বাঁশিতে যে ওহী বা ঐশীবাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, তা-ও কৃষ্ণের নয়, ঈশ্বরের। তাই বাঁশি ঠোঁটে কৃষ্ণের আসল পরিচয় তো এই যে, তিনি ছিলেন সেই যুগের নবী বা অবতার। তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাণী বা সুর, মানব কল্যাণের জন্য সেই যুগে অবতীর্ণ করা হয়েছিল। নবীরা যেমন নিজ থেকে কিছু বলেন না, বরং শুধু স্বর্গ থেকে যে বাণী তাদের নিকট অবতীর্ণ হয়, তার প্রচার করেন, যুগ-নবী কৃষ্ণও তাই করেছিলেন। তিনি স্বর্গের সেই অনুগম সুর তৎকালীন ভারতবাসীকে শুনিয়েছিলেন।

এবারে হিন্দু ধর্মের আরেকটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে আত্মার পুনর্জন্ম প্রসঙ্গ (Doctrine of reincarnation)। পৃথিবীর খুব স্বল্প সংখ্যক ধর্মই এ বিষয়ের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে, তবে বৌদ্ধ ধর্মে এর উল্লেখ রয়েছে। আত্মার পুনর্জন্ম প্রসঙ্গটি আবার দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সম্পর্কযুক্ত, (১) আন্তঃ এবং বস্তু অবিনশ্বর এবং (২) প্রধান অ-প্রধান সকল ঈশ্বরই শাশ্বত। তবে তাদের এ ধারণা অনুযায়ী আবার জীবন্ত মাত্রই একদম নতুন জীবন প্রাপ্ত হয় না। বরং আত্মার মধ্যে এমন কিছু চিরন্তন উপাদান আছে, যার উপর ভিত্তি করে নতুন সৃষ্টির উদ্ভব ঘটে থাকে। এ মতবাদ দৃষ্টে মনে হয় হিন্দু মতে সৃষ্টি কর্তা বা ঈশ্বর নাস্তি থেকে কোন কিছু তৈরী করতে পারেন না (no power to create something out of nothing). সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঈশ্বর এ মাতৃরূপ পৃথিবীকে (mother earth) মিশ্রণকারী গবেষণাগার হিসাবে ব্যবহার করেন, যেখানে পূর্বতন আত্মার চিরন্তন কোন উপাদানের সাথে বিভিন্ন বস্তুর অংশবিশেষ মিশ্রণ করে তিনি নতুন সৃষ্টির প্রকাশ ঘটান। এখানে ঈশ্বরের ভূমিকা যেন একজন ঔষধ প্রস্তুতকারীর (pharmacist) মত, যিনি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, পানি, চিনি ইত্যাদির মিশ্রণ ঘটিয়ে কোন একটা ঔষধ বা উপাদান তৈরী করে থাকেন।

এ বিষয়ে বিশেষ করে বিশ্ব সৃষ্টি পর্যায়ে নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে। হিন্দুমতে এ কার্যকলাপের পশ্চাতে ৩টি বড় বড় শক্তির ভূমিকা রয়েছে। প্রথম এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের অবস্থানে রয়েছেন ব্রহ্ম, হিন্দুদের সর্বপ্রধান ঈশ্বর, এবং তাকে সহায়তা করেছেন আরো কম ক্ষমতাসম্পন্ন একদল ঈশ্বরমন্ডলী। এ সকল ঈশ্বর বা দেবতার জন্য বিভিন্ন কাজ বরাদ্দ আছে যেমন, মেঘমালা সৃষ্টি, বজ্রপাত ঘটানো ইত্যাদি এবং এর মাধ্যমে তারা প্রধান দেবতা ব্রহ্মকে সহায়তা করছেন। নিজেদের কর্ম পরিধির মধ্যে এসব দেবতারা স্বাধীন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আপোষেই নিজ কাজ-কর্ম সম্পাদন করেন। অধিকন্তু, সম্পদ সৃষ্টি, উর্বরতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু জীবন প্রদান এ সবের দায়িত্বে রয়েছেন আলাদা দেব-দেবী এবং তারা সবাই অবিনশ্বর। এ সকল দেব-দেবীর কৃপা অর্জনের জন্য কি করণীয় তা-ও বর্ণিত হয়েছে এবং সেমতে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা, তা না হলে তারা রুষ্ট হতে পারেন এবং তার পরিণতি খুবই ভয়াবহ হতে পারে। কেননা, তারা স্বর্গে থাকলেও তাদের অবমাননা, অসন্তুষ্টি বা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে এ পৃথিবীতে যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে মানুষকে শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থানে রয়েছে আত্মা এবং জড় পদার্থ, যাদের সঠিক সংমিশ্রণই পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব ঘটে থাকে। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারেন শুধু ব্রহ্ম, যিনি দেবতার প্রধান, কেননা পদার্থ বা বস্তুর মধ্যে জীবন দানের ক্ষমতা ব্রহ্ম ছাড়া আর কারো নেই। (চলবে)

অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন

প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন ১ ঃ ঘরের প্রবেশ পথে বা অন্য কোন Prominent জায়গায় বুযূর্গ ব্যক্তির ছবি রাখা যায় কি না ।

উত্তর ঃ এটার উত্তর সহজ। যদি শির্কের নিয়্যতে ঝুলানো হয় তবে হারাম। আর যদি আহমদীয়তের প্রচারের উদ্দেশ্যে হয় তবে একেবারে বৈধ বরং পুণ্যের কারণ।

তবে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কিবলার দিকে যে দেয়াল রয়েছে সেখানে এমন কোন ছবি ঝুলাতে অনুৎসাহিত করেছেন যার কারণে নামাযে মানুষের মনোযোগ নষ্ট হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর ছবি সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে, তবলীগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। পূজা করার উদ্দেশ্যে বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে একে ব্যবহার করা নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন ২ ঃ ইসলামী পর্দার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ ইসলামী পর্দা কী এ বিষয়ে কুরআন শরীফে স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান। যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের মাঝে এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মাধ্যমে পর্দা-প্রথাকে পুনরায় জীবন্তরূপ দেয়া হয়। কাদিয়ানে ও পরবর্তীতে রাবওয়ায় পর্দার একটি বিশেষ রূপ দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আদর্শ আহমদী মহিলারা সেই পর্দাই পালন করে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় জলসায় মহিলাদের অধিবেশনের ভাষণে পর্দার উপর দিক-নির্দেশনা দেন। তিনি তিন ধরনের পর্দার কথা বলেন।

(১) উম্মাহাতুল মু'মিনীনের পর্দা - গৃহবধু ও আদর্শ আহমদী মহিলাদের পর্দা। মুখ ঢাকা ও ভারী ব্যক্তিত্বের পর্দা।

(২) চাকুরীজীবী মহিলাদের পর্দা - কর্মস্থলে মুখ খোলা রেখে কাজ করতে পারবেন তবে কোন ধরনের MAKE-UP সে সেক্ষেত্রে করা যাবে না।

(৩) গ্রামের পরিবেশে গ্রাম্য পর্দা বাড়ীর ঝোঁপ-ঝড়ের আড়ালটাই তাদের পর্দা।

ইংল্যান্ডের হিজরতের পর অমুসলিম বে-পর্দা মহিলাদের ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম রপ্ত করার জন্য সময় দেয়া হয়েছে। যেমন এক মহিলা আগে Skirt পড়তেন কিম্বা Sleeveless কাপড় পড়তেন। তাকে ভদ্র ও শালীন কাপড়ে অভ্যস্ত করাই ছিল পর্দার প্রথম ধাপ। তারপর তার চুল ঢাকার সৃষ্টি করাটাই ছিল একটি বিরাট জেহাদ। পরবর্তীতে তার Scarf ধীরে ধীরে বড় হয়ে আরও ভাল পর্দায় রূপান্তরিত হবে। Overcoat আর তার উপর বড় Scarf পাশ্চাত্যে বুরকার স্থলাভিষিক্ত। এখন পুরানো আদর্শ আহমদী মহিলারা যদি নতুনদের অনুসরণ করেন তবে এটা বোকামী হবে। কেননা, এ উপমহাদেশের পুরানো আদর্শ আহমদীদের দেখেই গোটা বিশ্ব আজ পর্দার দিকে আসছে। এ আদর্শবানরাই যদি শিথিলতা দেখান তাহলে খুঁটি নড়ে যাবে আর সারা সমাজ ও বিশ্বের অবস্থা আরও করুন হবে।

যদি কেউ বলেন, আহমদীয়া জামাতের বুরকার আদর্শ পর্দা কুরআনে বর্ণিত পর্দার চেয়ে বেশি কঠোর মনে হয়। তাহলে এর উত্তরও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিয়েছেন। লেকচার লাহোরে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ জগতের মানুষ যদি আধ্যাত্মিক হয়ে যায় তবে পর্দায় শিথিলতা ক্ষতির কারণ হবে না কিন্তু বর্তমান পাপের যুগে যখন মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রলোভিত হয়ে পড়ে এখন মহিলাদের পর্দা না করার অর্থই হচ্ছে নিরীহ ভেড়া-ছাগলের পালকে হিংস্র নেকড়ে বাঘের সামনে অসহায় অবস্থায় রেখে দেয়া।

মুখ খোলা রেখে Public Place এ কথা বলা যথাসম্ভব Avoid করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু খলীফা সালেস (রাহেঃ) একটি ক্ষেত্রে এর অনুমতি দিয়েছেন, আর তা হলো সফরে হোটেল বা রেষ্টুরেন্টে মহিলারা খেতে বসতে পারেন এবং নির্দ্বিধায় খেতে পারেন। খলীফা রাবে' চাকুরীজীবী মহিলাদেরকে কর্মস্থলে মুখ খোলা রেখে কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন।

শেষে বলতে হয়, পর্দা একটি ভারীক্কির প্রতীক, পর্দা সুস্থ ও নেক মানসিকতা বজায় রাখার একটি মাধ্যম, পর্দা মহিলাদের সমাজে বিচরণ করার পোশাক। Oxford এ এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর পর্দার Definition দিয়ে বলেছেন ঃ To Dress with fear of God পর্দা জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে মহিলা ও পুরুষ উত্তরের ভেতরের চেতনা জাগ্রত করে দেয়ার সাথে এটা অধিক সম্পৃক্ত। পর্দা করাতে হলে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করা মোটেও উচিত নয়। বরং বুঝিয়ে অনুরোধ করে আরম্ভ করালে আল্লাহ্তাআলা নিজ থেকেই তাকে ঈমানের জোর দিবেন, নিদর্শন দিবেন। ক্লাস এইট থেকে মেয়েদের পর্দা করালে ভাল। এখন বাংলাদেশে এ বিষয়ে যথেষ্ট শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়।

মহিলারা বর্তমান পরিবেশে আইন ব্যবসা করতে পারবেন কিনা - এর উত্তর হলো, বর্তমান পরিবেশে পারবেন না। আমি এমটিএ-তে সরাসরি হুযূরের এক প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে শুনেছি। একজন পাকিস্তানী আহমদী মহিলা ঠিক একই প্রশ্ন হুযূরকে করেছিলেন। হুযূর উত্তরে বলেন, বর্তমান নষ্ট পরিবেশে কোর্ট কাচারীতে আহমদী মহিলারা আইন ব্যবসা করতে পারবেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের কোর্ট কাচারীর পরিবেশও অত্যন্ত নোংরা - তাই একই কথা আমাদের জন্য প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ঃ দাড়ি রাখার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ জামাতের কর্মকর্তাদের দাড়ি রাখাটা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আহমদীয়ত একটি ঐশী জামাত। এ জামাতের কাজ সারা জগতকে আল্লাহ্র দিকে ডাকা, আল্লাহ্মুখী করা। আহমদীদের আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক থাকলেই কেবল তারা জগতকে আল্লাহ্র দিকে ডাকতে সক্ষম। আল্লাহ্র ভালবাসা যাদের মাঝে থাকে, রসূলের ভালবাসা যাদের মাঝে থাকে তাদের কিছু বাহ্যিক চিহ্নও থাকে। এগুলোর মাঝে দাড়িও একটি। তবে এ দাড়ি যেন লোক দেখানো না হয় - কর্মকর্তা হবার জন্যও যেন

এ দাড়ি না হয়। যদি কেউ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও দাড়ি না রেখে থাকেন তবে তাকে সুন্দরভাবে বুঝানো উচিত। যদি এতদ্ সত্ত্বেও তিনি না বুঝেন তবে তার বিষয়টিকে আল্লাহ্‌র প্রতি ছেড়ে দেয়া উচিত। পরবর্তী নির্বাচনে জামাতের সদস্যরাই অধিক যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করে নিবে।

দাড়ি নিয়ে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যেন না হয় এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

- মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মহা সৃষ্টির অন্তরালে

বিশ্ব-প্রভু মহান আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টির রহস্যাবলী নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তাভাব-না করলে জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি অসার বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। কবির কল্পনা সাহিত্যিকের সাধনা, দার্শনিকের ধারণা, বৈজ্ঞানিকের গবেষণা সবই স্তব্ধ হয়ে যায়। "কে সৃষ্টি করেছেন আসমান জমীন? আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, ফলে আমরা সাজিয়েছি সজীব বাগান। তোমাদের সাধ্য ছিল না এমনি গাছপালা সৃষ্টি করা"।

(সূরা নমল) "আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। তার ফলে আমরা উৎপন্ন করেছি বিভিন্ন বর্ণের ফল-ফলাদি। তাছাড়া পর্বতেরও বিভিন্ন অংশের বর্ণনা আলাদা, কোনটা শুভ্র কোনটা লোহিত আবার কোনটা গাঢ় কৃষ্ণ। তাছাড়া এমনিভাবে মানুষ জীব চতুষ্পদ জন্তুগুলিরও বর্ণ বিভিন্ন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষের মধ্যে জ্ঞানের মধ্যেই, একমাত্র জ্ঞানীগণই আল্লাহ্‌কে ভয় করে থাকে" (সূরা ফাতের)। আল্লাহ্‌তাআলা নিজেই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে বলেছেন, "বল, কে কি সৃষ্টি করেছে এতো আল্লাহ্‌তাআলারই সৃষ্টি।" "ফলতঃ তোমরা যা রোপণ কর তা কি লক্ষ্য করেছো? তবে কি তোমরাই ইহা অঙ্কুরিত কর, না আমিই অঙ্কুরিত করি।" "তোমরা কি পানির প্রতি লক্ষ্য করেছো যা তোমরা পান কর? তবে কি তোমরাই ইহা মেঘ থেকে অবতরণ করাও না আমিই অবতরণকারী?" "যদি আমি ইচ্ছা করি তবে আমি তাকে লবণাক্ত করে দিতে পারি তথাপি কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর না" (সূরা ওয়াকেয়া)। কোন্ সে মহা বৈজ্ঞানিক নিপুণ কারিগর, যার শিল্প নিপুণতায় আসমান, জমীন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়, পর্বত, বিস্তীর্ণ মরু প্রান্তর গাছপালা তৃণ লতা ফলে ফুলে শস্য ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়েছে এ সুন্দর মহা সৃষ্টির উদ্ভব? কোন্ করুণাময় যাঁর দয়ায় একই মাটি ও উপাদানে সৃষ্টি একই স্থানে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, শাক্-সব্‌জি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। এ সকল ফল-ফলাদির স্বাদ একটার সাথে আরেকটার কোন মিল নেই। আম খেয়ে কেউ একথা বলে না যে, আমি কাঁঠালের মত স্বাদ পেয়েছি। তেমনিভাবে জাম খেয়ে কেউ বলে না যে, আমি লিচুর মত স্বাদ পেয়েছি। একই মাটির উপাদানে সৃষ্টি ঝাল, টক, মিষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলাদি শাক্-সবজি উৎপন্ন হচ্ছে। পৃথিবীর বুকে এমন কোন জ্ঞানী-বিজ্ঞানী তার গন্ডি অতিক্রম করতে পারে? পারবেও না। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "কিন্তু তোমরা ঐ আধিপত্য অতিক্রম করতে পারবে না"। (সূরা রহমান)।

"তিনিই অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের জন্য আকাশ হতে পানি। তাতে আছে তোমাদের জন্য পানীয়। তার সাহায্যে জন্মে থাকে গাছ-পালা তাতে তোমরা পশু চরিয়ে থাক। তিনি তদ্বারা উৎপাদন করে থাকেন তোমাদের জন্য শস্য, জয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং নানা রকমের ফল। যথার্থই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আছে অনেক নিদর্শন। আর তিনি অনুগত করেছেন তোমাদের পক্ষে দিনরাত চন্দ্র-সূর্য এবং তারকাগুলোকে এসব আনুগত্য তাঁরই নির্দেশে। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে যে সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপলব্ধি করে থাকে। আর যা কিছু পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের, নিশ্চয়ই এর নিদর্শন রয়েছে উপদেশ গ্রহণকারী জাতির পক্ষে।

তিনিই সমুদ্রকে করেছেন তোমাদের অনুগত। তোমরা যেন তা হতে খেতে পাও তাজা মাছ। তোমরা তা হতে খুঁজে বেড়াও অলঙ্কার পরার জন্য। আর দেখে থাক তাতে সমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণকারী তরী ও জাহাজগুলো। যেন তোমরা তাঁর করুণা অন্বেষণ করতে পার। তোমরা যেন কৃতজ্ঞ হও। আর বিছিয়ে দিয়েছেন তিনি পৃথিবীর উপর পর্বতগুলো যেন তা তোমাদের নিয়ে দুলতে না পারে। আরও দিয়েছেন তিনি নদী-নালা এবং রাস্তাগুলো যেন তোমরা পথের সন্ধান পাও। আরও দিয়েছেন তিনি কত চিহ্ন। আর তারকার সাহায্যে তারা পথের নির্দেশ লাভ করে। যিনি সৃষ্টি করেন আর যারা সৃষ্টি করে না; কখনও তুল্য হতে পারে কি" (সূরা নাহল)।

মানুষ যদি তার নিজের জন্ম ও মৃত্যুর রহস্যাবলী নিয়ে একটু ভেবে চিন্তে দেখে তাহলে তার মন-মস্তিষ্কে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয় তার গর্ব অহংকার আস্ফালন বিদ্যা-বুদ্ধিকে চূরমার করে দেয়। কেননা, সে নিজেই জানে না তার নিজের পরিচয়। এই কিছু দিন আগেও এ পৃথিবীতে তার কোন নাম গন্ধ ছিল না। সে নিজেই বুঝে না যে, কোথা থেকে সে এসেছে কোথায় সে যাবে। মহান আল্লাহ্‌তাআলা কি নিপুন কৌশলে এক বিন্দু নিকৃষ্ট পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, ভাবলে হতভম্ব হতে হয়।

"মানুষকে চিন্তা করা উচিত যে, কোন বস্তু দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সবেগে নির্গত পানি দ্বারা যা পৃষ্ট ও পাঁজরের মাঝ থেকে নির্গত হয়ে থাকে (সূরা তারেক)। "মানুষকে আমি ঘণীভূত রক্ত হতে সৃষ্টি করেছি" (সূরা আলাক) "শুক্রবিন্দু হতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" "মানুষকে আমি মাটির পাত্রের ন্যায় মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি" (সূরা সাফ্‌ফাত)

"তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে রূপ আকৃতিতে ইচ্ছা সংযোজন করেছেন" (সূরা ফাতের)। "তিনি স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন

করেছেন" (সূরা আলে ইমরান)। "নর নারীর যা তিনি সৃষ্টি করেছেন" (সূরা লায়েল)। "মানুষকে আমি অতি সুন্দর ও সুপরিচিতভাবে সৃষ্টি করেছি" (সূরা তীন)।

মাটির উপাদান মানুষের সৃষ্টি। ভাত, মাছ, ফল-মূল, শাক্-সব্জি তরি-তরকারী ইত্যাদি খেয়ে মানুষ জীবন ধারণ করে থাকে। এ খাদ্যের সারাংশ থেকে মানব দেহে রক্তের সৃষ্টি হয়। রক্ত থেকে হয় মাংস, হাড়, অস্থি, মজ্জা, ইত্যাদি। এ মজ্জা থেকে হয় বীর্যের সৃষ্টি। নর ও নারীর মিলনে পুরুষের বীর্য নারীর জরায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বীর্য পরিণত হয় এক বিন্দু রক্ত কণায়। অতঃপর আস্তে ধীরে সেই রক্ত বিন্দু থেকে মাংস অস্থি, মজ্জা ইত্যাদি গঠিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে আসে মায়ের উদর থেকে। "এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তৎপর বীর্য হতে, অতঃপর তোমাদেরকে যুগল করে দিয়েছেন এবং তার জ্ঞান ব্যতীত কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং সে জন্ম দানও করতে পারে না। এবং কারো আয়ুষ্কালকে আয়ু দান করা হয় না এবং কারো আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু উহা গ্রন্থে রয়েছে। নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজ সাধ্য' (সূরা ফাতের)। এই মানব শিশুর মধ্যেই আবার দেখা যায় দ্বিজাতীয় সৃষ্টি। পুরুষ ও নারী যাদের আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন। "পুরুষ ও নারীকে আমি যুগলরূপে সৃষ্টি করেছি" (সূরা নাবা) "নর ও নারী যা তিনি সৃষ্টি করেছেন" (সূরা লায়েল)।

"এবং আমি প্রত্যেক বিষয়ের জোড়া সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা অনুধাবন কর" (সূরা যারিয়াত)।

মাতৃ-গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও শিশুরা থাকে সম্পূর্ণ অসহায়। না পারে হাঁটতে না পারে কথা বলতে, শুধু কান্না ব্যতীত আর কিছুই পারে না বা বুঝে না। শিশুরা আস্তে ধীরে ক্রমশঃ বড় হয়। কৈশোর যৌবন প্রৌঢ় অবস্থা অতিক্রম করে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কেন যে এমন হয়, কেউই তা বুঝতে পারে না। বলতেও পারে না। জন্মিলে মরিতে হয়, কেউ এ ধরায় অমর নয়। ধনী, দরিদ্র, রাজা বাদশা, নবী, রসূল সকলেই মৃত্যুর অধীন। ডাক্তার, কবিরাজ, ওঝা, বৈদ্য, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী কেউই তার মূল্যবান জীবনীকে ধরে রাখতে পারে নি, পারবেও না। "অতঃপর যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে তখন কেন উহা রোধ কর না? তখন তোমরা শুধুই তাকিয়ে থাক। এবং আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর থাকি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। অতএব যদি তোমরা শক্তিহীন না হও তবে কেন উহা রোধ কর না" (সূরা ওয়াকেয়াহ্)।

মানুষ মরতে চায় না। তবুও তাকে মরতে হবে। মৃত্যু যখন মানুষের জন্য অনিবার্য তখন মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করা একান্ত প্রয়োজন। যে মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করে না সে স্বপ্ন রাজ্যে বাস করে। মানব শিশু মাতৃ গর্ভে অবস্থানকালে দুনিয়ার কোন কিছুই জানতো না, বুঝতো না, হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো না। "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে মৃত্তিকার রস থেকে সৃষ্টি করেছি। তৎপর ইহাকে শুক্র করে উৎকৃষ্ট বিশ্রাম স্থলে স্থাপন করেছি। তৎপর শুক্রকে একটি রক্তখন্ডে পরিণত করেছি, তৎপর রক্তখন্ডকে মাংসপিন্ড করেছি, তৎপর ঐ মাংসপিন্ডকে হাড়ে পরিণত করেছি, তৎপর ঐ হাড়গুলিকে মাংস দ্বারা সজ্জিত করেছি, অতঃপর অন্য এক অবস্থায় তাকে পরিণত করেছি। সুতরাং সর্বোচ্চ সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ। তৎপর তোমাদের নিশ্চয়ই মৃত্যু হবে (সূরা মু'মিনূন)। দেখা যাচ্ছে আমি বলতে দুনিয়ায় কিছুই ছিল না। আমি মাতৃ-পিতৃ শুক্রের সংযোগ মাত্র। এ শুক্রবিন্দু থেকে মহান কারিগর আল্লাহ্তাআলা সুকৌশলে বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত করতঃ সেই জীবন হীন দেহে আত্মা বা প্রাণ দিয়েছেন।

পরম করুণাময় আল্লাহ্তাআলার সৃষ্টি রহস্যাবলী নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করে দেখলে অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, সৃষ্টি সেরা মানুষের প্রতি তিনি কত বড় দয়ালু। মানুষেরই কল্যাণের নিমিত্তে মানুষেরই সুখ শান্তির জন্য আসমান জমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তৎসমুদয় সৃষ্টি করেছেন। তাঁরই সৃষ্টির সেরা মানুষ যাতে পৃথিবী বুঝে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়ে দুঃখ-কষ্ট অশান্তি ও আঘাতে পতিত না হয় এ জন্য তিনি প্রতি যুগে এক একজন প্রেরিত মহাপুরুষকে দুনিয়ায় আবির্ভাব করেছেন। ইহা মানুষের প্রতি তাঁর দয়ার এক চরম নিদর্শন। নিশ্চয়ই আমার দিক হতে তোমাদের নিকট হেদায়াত আসবে। যারা আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে তাদের কোনই ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না" (সূরা বাকারা)। "তিনি গুপ্ত তত্ত্বের অধিকারী। তিনি যাকে নবী বলে মনোনীত করেন তদ্ব্যতীত অন্য কারো নিকট ইহা প্রকাশ করেন না" (সূরা জীন)। "সুতরাং তাদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ কর" (সূরা আল্ আনআম)।

বর্তমান যুগে মানব জাতি যে সুখ-শান্তিশূন্য আত্মিক নৈতিক প্রত্যেক স্তরে বিপদে পরিপূর্ণ, মানুষে মানুষে জাতিতে, জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে রাজ্যে আর রাজ্যে প্রতিকূলাচরণে মত্ত, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার-অবিচার নির্যাতন সৃষ্টি সেরা মানুষের রক্তপাত নিত্য ক্রীড়ার সামগ্রী হয়ে ছাড়িয়েছে, মানুষরুপী দানবের শোণিত তৃষ্ণায় লেলিহান ছায়া প্রসারণকরতঃ তান্ডব লীলায় পৃথিবীকে আবাসের অযোগ্য করে তুলেছে, একথা আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন রাখে না। মানব জাতির এরূপ চরম অধঃপধনের যুগে করুণাময় আল্লাহ্তাআলার চিরন্তন বিধানুযায়ী মানব জাতির উদ্ধারকল্পে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে আখেরী জমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করেছেন। তিনি এসে মানুষে-মানুষে হিংসা -বিদ্বেষ দলাদলি রেষারেষি, মারামারি, কাটাকাটি রক্তারক্তি ইত্যাদি বলে গিয়ে একই শান্তির পতাকাতলে সমাবেত হওয়ার আহ্বান জানালেন। তাই আসুন আল্লাহ্র মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে আল্ কুরআনের নির্দেশিত পথে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করে পৃথিবীর বুকে জান্নাত গড়ে তুলি।

- সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(২৫তম কিস্তি)

খোদা-ভীরুতা ও অভাবমুক্ততার জন্যে দোয়া

◆ হযরত আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সচরাচর এ দোয়াটি পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰی وَالتُّقٰی وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰی۔ (مسلم کتاب الذکر)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকাল হুদা ওয়াত্তুক্বা ওয়াল 'আফাফা ওয়াল গিনা- মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে সঠিক পথ, খোদা-ভীরুতা চাচ্ছি। আর উচ্চ মার্গের সাধুতা ও অভাবমুক্ততা চাচ্ছি।

খোদা-ভীরু মানুষে পরিণত হওয়ার দোয়া

◆ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ الَّذِیْنَ اِذَا اَحْسَنُوْا اِسْتَبْشَرُوْا وَاِذَا اَسَاؤُا اِسْتَغْفَرُوْا۔ (مسند احمد مطبوعہ بیروت جلد ۶ صفحہ ۱۲۹)

(আল্লাহুম্মাজ'আলনী মিনাল্লাযীনা ইযা আহসানূ ইসতাবশারূ ওয়া ইযা আসাউ ইসতাগফারূ - মুসনাদ আহমদ, বৈরুতে মুদ্রিত, ৬ খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৯)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে ঐসকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর যারা পুণ্য করে তখন খুশী হয় আর যখন পাপ করে তখন ক্ষমা চায়।

পুণ্য লাভের দোয়া

◆ রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্তাআলাকে অনেক সুন্দর আকৃতিতে দেখেন। তিনি বলতেন, আমাকে আমার প্রভু-প্রতিপালক এ দোয়া পাঠ করার জন্যে বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِیْنِ، وَاِذَا اَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِیْ اِلَیْكَ غَیْرَ مَفْتُوْنٍ۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা ফি'লাল খয়রাতি- ওয়া তারকাল মুনকারাতি - ওয়া হুব্বাল মাসাকীনি- ওয়া ইযা আরাদ্‌তা বিক্বওমিন ফিতনাতান ফাক্বিযনী ইলায়কা গযরা মাফতূন- তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগ করার সৌভাগ্য চাচ্ছি। আমাকে দারিদ্রের প্রতি ভালবাসা দান কর। আর যখন তুমি কোন কোন লোককে বিপর্যয় ফেলতে চাও তখন বিপর্যয়ে নিপতিত না করে আমার রূহ কবয কর।

সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার দোয়া

◆ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ عَافِنِیْ فِیْ جَسَدِیْ، وَعَافِنِیْ فِیْ سَمْعِیْ وَ بَصَرِیْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّیْ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِیْمُ الْكَرِیْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফী জাসাদী ওয়া 'আফিনী ফী সাম'ঈ ওয়া বাসারী ওয়াজআলহুমাল ওয়ারিসা মিন্নী-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রব্বিল 'আরশিল 'আযীম ওয়াল হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন - তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার দেহকে সুস্থ রাখো আর আমার শ্রবণেন্দ্রীয় ও দর্শনেন্দ্রীয়কেও স্বয়ং সুরক্ষা কর। আর আমার জন্যে ওদেরকে স্থলাভিষিক্ত কর। আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই আর যিনি সহিষ্ণু ও মহান দাতা। তিনি পবিত্র যিনি মহান আরশের প্রভু। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।

অকল্যাণের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

◆ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির কাজ-কর্মে অকল্যাণ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সে-ও শির্ক করে। সাহাবা (রাঃ) জানতে চাইলেন, এর সমাধান কী? তিনি বললেন, এ দোয়া করতে থাক ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا طَیْرَ اِلَّا طَیْرُكَ وَلَا خَیْرَ اِلَّا خَیْرُكَ وَلَا اِلٰهَ غَیْرُكَ۔ (مسند احمد مطبوعہ بیروت جلد ۲ صفحہ ۲۲۰)

(আল্লাহুম্মা লা ত্বয়রা ইল্লা ত্বয়রুকা ওয়ালা খয়রা ইল্লা খয়রুকা ওয়া লা ইলাহা গয়রুকা - মুসনাদ আহমদ, বৈরুতে মুদ্রিত, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ২২০)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার অমোঘ নিয়তির অনিষ্ট ছাড়া কোন অনিষ্ট হতে পারে না আর তোমার মঙ্গল ছাড়া কোন মঙ্গল নেই এবং তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।

ঐশী দান লাভের দোয়া

◆ হযরত উমর (রাঃ) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ দোয়া বর্ণনা করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَاَكْرِمْنَا، وَلَا تُهِنَّا، وَاَعْطِنَا، وَلَا تَحْرِمْنَا، وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَیْنَا وَارْضَ عَنَّا۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা যিদ্‌না ওয়ালা তানুকুসনা ওয়া আকরিমনা ওয়ালা তুহিন্না-ওয়া আত্বিনা ওয়ালা তাহরিমনা-ওয়া আছিরনা ওয়ালা তু'ছির আলায়না ওয়ালা আরযিনা ওয়া আরযা আন্না - তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বাড়িয়ে দাও, আমাদের কম করো না। আর আমাদেরকে সম্মান দাও এবং লাঞ্ছিত হওয়া থেকে রক্ষা কর। আর আমাদেরকে দাও আমাদেরকে বঞ্চিত করো না। এবং আমাদের মত মু'মিনদেরকে প্রাধান্য দাও। আমাদের ওপরে কাউকে প্রাধান্য দিও না। আর আমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখ এবং তুমি স্বয়ং আমাদের প্রতি সন্তুষ্টি হয়ে যাও।

খোদা-ভীতি ও পূর্ণ ঈমান লাভের দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন কোন সভা থেকে উঠে যেতেন তখন নিজের জন্যে ও তাঁর সাহাবীদের জন্যে এ দোয়া অবশ্যই করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا يُهَوِّنُ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا، وَاَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মাক্বসিমলানা মিন খশইয়াতিকা মাতাহূলু বায়নানা ওয়া বায়না মাআসীকা ওয়া মিনত্বা'আতিকা মাতুবাল্লিগুনা বিহী জান্নাতাকা-ওয়া মিনাল ইয়াক্বীনি মা ইউহাওবিনু 'আলায়না মুসীবাতিদ্দুন্য়া-ওয়া মাত্তি'না বি আসমা'ইনা ওয়া আবসারিনা ওয়া কুওওয়াতিনা মা আহ্ইয়্যাইতানা-ওয়াজ 'আলহুলওয়ারিছা মিন্না ওয়াজআলছ'রানা 'আলা মান যালামানা-ওয়ানসুরনা 'আলা মান 'আদানা 'ওয়ালা তাজ'আল মুসীবাতানা ফী দীনিনা - ওয়ালা তাজ 'আলিদ্দুনয়া আকবারা হাম্মিনা 'ওয়ালা মাবলাগা 'ইলমিনা ওয়ালা তুসাল্লিত্ব 'আলায়না মান্লা ইয়ারহামনা - তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার সেই ভীতি আমাদেরকে দান কর যা আমাদের ও তোমার প্রতি অবাধ্যতার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আর আমাদের এমন আনুগত্যের সৌভাগ্য দাও যার সাথে তুমি আমাদেরকে তোমার বেহেশ্ত পর্যন্ত পৌছে দাও। আর এমন দৃঢ়-বিশ্বাসের সৌভাগ্য দাও যা আমাদের জন্য পার্থিব দুঃখ-কষ্ট সহজ করে দেয়। আমাদেরকে আমাদের কান, চোখ ও শক্তি-সামর্থ্য ও কল্যাণ দাও যতদিন তুমি আমাদেরকে জীবিত রাখো, আর আমাদের ঐ শক্তির উত্তরাধিকারী কর। যে ব্যক্তি আমাদের ওপরে নির্যাতন চালায় তাথেকে স্বয়ং তুমি প্রতিশোধ নাও। আর যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। তোমার ধর্মের ব্যাপারে বিপদে ফেলো না আর পৃথিবীকে আমাদের সবচে' দুঃখের জায়গা বানিও না এবং জ্ঞানের অহংকার যেন আমাদের জন্য প্রতিবন্ধক না হয়। আর আমাদের ওপরে এমন লোককে চাপিয়ে দিও না, যে আমাদের প্রতি দয়া করে না। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

কবিতা

জাগার গান

আর কতকাল র'বে ঘুমে অচেতন
ওহে, ওয়ারেসাতুল আম্বিয়াগণ।
এক আল্লাহ্ এক রসূল
কেন তবে ফিরকা অগণন॥
কেতাবের কোন্ পাতায় লিখা
শীয়া, সুন্নী, পীর, মুরিদীর নাম।
খন্ড খন্ড কেন আজি ওরে
আল্লাহ্র কালাম॥
শৃখাল শকুনী গৃধিনীর দল
চারিদিকে তোমায় ঘিরে
রক্ত চোখে হাড়-মাংস কেন
খাচ্ছে টেনে ছিঁড়ে॥
ধর্মের নামে নানান পথে নানান দলে
ফিরকা বন্দী কেন?
কোন্ সে পাপে মুসলিম জাতির বল
করুণ দৃশা হেন॥
যারা ছিল একদিন ধরণীর বুকে
মানে-মর্যাদায় শৈর্যে বীর্যে শক্তিমান।
তারাই কেন পদদলিত
দেহে নাইকো আজ প্রাণ॥
মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই
একথা শুধু কেতাবেই আছে লিখা।
লম্বা জুব্বা জামা গায়ে দিয়ে কর
সুন্নতের অহমিকা॥
ধরণীর বুকে এক পরিবার সম
ভাই ভাই যারা এক প্রাণ।
স্বার্থের নেশায় ঠাঁই ঠাঁই হয়ে
সেজে গুজে শুধু নামে মুসলমান॥
হিংসার ঘূণ অন্তরে তব,
ঈমানের নাহি আছে কোন লেশ।
একতা মমতা, ভাতৃত্ববোধ বিদায় দিয়ে
জাতির ললাটে এসেছে নেমে দুঃখ-বেদনা-ক্লেশ॥
হেন কালে এলেন আল্লাহ্র মাহ্দী
ডেকে কহে বিশ্ব-ভূমি।
জাগো ওঠো ওরে বেহুশ
থেকো না আর ঘুমে॥
হিংসা-বিদ্বেষ দলা দলি ছাড়ি'
আল্লাহ্র 'রজ্জুকে' ধর কষি আজ।
হেরিবে, তোমার চরণ তলে পড়বে লুটে
রাজা-বাদশার তখ্ত তাজ॥

-সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

স্মৃতি কথা

ছোট কিন্তু প্রাণবন্ত

❑ আমাদের শিশু বয়সে গ্রামে হিন্দু মুসলমান বাস করতো। হিন্দুদের মাঝে বাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শুদ্র ছিলো। মুসলমানদের মাঝেও বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক ছিলো। পীর-ফকিরদের ভক্তও বেশ ছিলো। একদিন এক লেংটা ফকির এসে হাজির। যে বাড়িতে তিনি ওঠালেন সে বাড়িতে খানিকক্ষণের মাঝে শতাধিক লোক এসে হাজির। পীর সাহেব দেখতে বেশ মোটা - সোটা ছিলেন। তিনি কোন দিকে চোখ বুঝে মুখ করলে ওদিকে উপস্থিত লোকদের অমংগলের ইঙ্গিত বহন করতো। যেদিকে চোখ খোলা রেখে চাইতেন সেদিকের উপস্থিত লোকদের জন্য কল্যাণবহ ছিলো। উপস্থিত লোকজন এ ধরনের কথাবার্তায় যখন মশগুল তখন হঠাৎ তিনি বল্লেন, কওতো আল্লাহ্‌র তালুই কে?' সবাই চুপ। আমি বল্লাম, 'আব্দুল্লাহ্' পীর সাহেব বল্লেন, বাচ্চা ঠিক বলেছে। আমার পায়ে কদমবুসি করার জন্য অনেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এক ফাঁকে দৌড় দিয়ে বাড়ি এসে পড়ি। বেশ সংখ্যক লোক দৌড়ে আমাদের বাড়ী এসে হাজির। আমার বাজান বল্লেন, মোস্তফা কি কারো সাথে বেয়াদবী করেছে? যারা আসছিলেন অনেকেই বল্লেন না, বেয়াদবী করবেন কেন, উনার হাসিল হয়ে গেছে। উনাকে কদমবুসি করতে এসেছি আমরা। বাজান উঠে এসে দেখেন আমি খেতে বসেছি। মা খাওয়াচ্ছেন আর বলছেন খেলার টানে তুই খাওয়ার কথাও ভুলে যাস।

আমার এক খেলার সাথী জিজ্ঞেস করলো, তুই কি করে জানালে আবদুল্লাহ্ খোদার তালুই? কেন দোস্তের বাপতো তালুই হয়। ওয়াজে মৌলবী সাহেবরা বলেন যে, আল্লাহ্‌র দোস্ত মুহাম্মদ (সঃ)। দোস্তের বাপতো তালুই-ই হন।

❑ গ্রামে জন্ম এবং ক্লাস থ্রী পর্যন্ত গ্রামেই পড়াশোনা করি। বেশ বড় হয়ে পড়তে যেতে হলো। পড়ার কথা বল্লেই সমবয়সী মামু ও আরো কয়েকজনে মিলে খেলায় মত্ত হয়ে যেতাম। দেশীয় খেলায় খরচপাতি খুবই কম। উপাদান উপকরণও মুঠোর মধ্যেই ছিলো। মার কাছে আবদার করলে দু'চার আনার পয়সা দিয়ে দিতেন। বাজান (তখন আব্বা আম্মা শব্দগুলো গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত হয় নি) নিজস্ব কৃষি এবং পাট ব্যবসা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতেন। তিনি অনেক গরীব হিন্দু ছেলের পড়ার খরচপাতি বহন করতেন। আমি পড়াশোনা করছি না- একথা বল্লে, উত্তরে তিনি বলতেন ও পড়বে, তোমরা এতো ব্যস্ত হয়ো না। তিনি সবকিছুতেই কল্যাণের দিকটা আগে এবং বেশি দেখতেন। একদিন এক গণক আসেন। পাশের গ্রাম তাল শহরে বাড়ি। ২/৩ মাস পর পর আসতেন। গণাগণির জন্য কিছু চাউল নিয়ে যেতেন। একদিন ঐ গণক আসলে তাকে কয়েক জন মুরব্বী বল্লেন- আমি পড়া লেখা করি না। আমার হাতে বিদ্যা আছে কিনা। বেশ কতক্ষণ ডান বাম দু'হাত দেখার পর বল্লেন, হাতে বিদ্যার চিহ্ন মাত্র নেই। এ ছেলে মূর্খই থেকে যাবে। গণকের কথা শুনে আমার কি মজা! দৌড়ে গিয়ে খেলার প্রধান সাথী চান মিয়া মামুকে সব বলি। পাশের বাড়িই মামুর বাড়ি। বড় মামুকে আমরা সবাই খুব সমীহ ও ভয় করতাম। সব শুনে বড় মামু বল্লেন- মোস্তফা আগামীকাল দুপুরে আমার সাথে খাবে। মামুর বাড়িতে খেতে গিয়ে দেখি চান মামুও আটকে আছে। যাক্ আমাদের বড় মামু দু'জনকে দুটো শিশু শিক্ষা বই দেন ও রোজ তাঁর কাছে পড়তে যেতে বলেন। তিনি আমাদেরকে স্নেহের সাথে ঘন্টা খানেক পড়াতেন। মাস ৪/৫ এর মধ্যে বইটি পড়া শেষ হয় এবং অক্ষর লেখাও মোটামুটি হয়ে যায়।

আমাদের এলাকায় ৫টি গ্রামের জন্য একটি প্রাইমারী স্কুল ছিলো প্রেমতলা নামক স্থানে। ওটাতে ভর্তি হই। বর্তমানে আমাদের গ্রামেই (নাম তারুয়া) সরকারী অনুমোদনে ৫টি প্রাইমারী স্কুল চলছে। উল্লেখ্য যে, এখন প্রেমতলার কোন অস্তিত্বই নেই।

আমার দেয়া জমিতেই সরকারী প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে শুধু ছেলে নয় মেয়েরাও পড়াশুনা করে।

পাশের গ্রামের গণক মশাইকে আর কোন দিন দেখতে পাই নি। অপরদিকে স্কুল জীবনে প্রায়ই হোল প্রেজেন্ট এর জন্য কয়েকবার পুরস্কার পেয়েছি।

ঐ জীবনের ৩টি বিষয় ভুলতে পারি নি আর তা হলো ঃ (১) খেলার সামগ্রী কত সস্তা ও (২) সহজলভ্য ছিলো। (৩) এখন নানা বিদেশী খেলা সব গ্রাস করেছে। এখন ক্রিকেট ও ফুটবল ইত্যাদি খেলার সরঞ্জাম সাথে নিয়ে শিশুরা ঘুমোয়।

- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ইসলাম ধর্মে পরস্পর সহযোগিতা

ইসলাম নির্দেশিত পথে চলার মাঝেই মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত রয়েছে। ঐশী জামাতে আলোকিত মুসলমানকে একই পতাকাতলে একতা ও সংহতি বজায় রেখে প্রগতির পথে চলতে হয়। একতার শৃঙ্খল ভঙ্গ করে মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলার কোন সুযোগ আল্লাহ্‌র মনোনীত জামাতে নেই। সদা-সর্বদা ঐশী নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে একতাবদ্ধ হয়ে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। ইলাহী জামাতে সকল মুসলমানকে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে ঐকমত্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে চলতে হবে। অন্যথায় বিপর্যয়কর পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তা ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়বে। তবে সংকটময় পরিস্থিতিতে বিদ্রোহী শক্তিও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কোন দানবীয় অপশক্তি সামাজিক পরিমন্ডলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাতে পারে। এ ব্যাপারে মু'মিন - মুত্তাকীগণকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে এবং অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শীসাগলিত প্রাচীরের দৃঢ়তা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমনের মধ্য দিয়ে শান্তি ও প্রগতির ধর্ম ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। পূর্ববর্তী নবী-রসূলের অনুপম শিক্ষাবলী এবং ঐশী বাণীসমূহের নির্যাস এর সমাহার পূর্ণতাপ্রাপ্ত শরীয়তগ্রন্থ কুরআন মজীদে ঘটেছে। কাজেই ইসলামের গন্ডীর বাইরে অবস্থান করে কেউ পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবে না। ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী সুচারুরূপে ঐশী জামাতের দ্বারা ইসলাম ধর্মের প্রচার কার্যক্রম চলছে। কাজেই এগিয়ে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেন, এবং তোমরা পুণ্য কাজে এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর (সূরা মায়েদা ঃ ৩)। মহান আল্লাহ্ মন্দ কথার প্রকাশ ভালবাসেন না (সূরা নিসা ঃ ১৪৯)। ইসলাম জনসমক্ষে অপরের নিন্দা করা বা অপরকে গালাগালি করা নিষেধ

করে। তবে অত্যাচারিত ব্যক্তি আক্রান্ত অবস্থায় চিৎকার করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। যাতে অন্যরা এসে দ্রুত সাহায্য করতে পারে। সে বিচারালয়ে বিচার প্রার্থী হতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থায় দুর্নাম বা কুৎসা করে বেড়াতে পারে না।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, তোমার ভ্রাতার সাহায্য কর হোক না সে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! অত্যাচারিত ভ্রাতার সাহায্যের ব্যাপার তো আমরা বুঝলাম, কিন্তু অত্যাচারী ভাইয়ের সাহায্য কী করে করব? তিনি (সঃ) বললেন, তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রেখে অর্থাৎ অত্যাচারীর অত্যাচার প্রতিরোধ করে (বুখারী)। বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সেই বান্দা কখনো প্রকৃত মু'মিন নয় যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালবাসে তা নিজ ভাইয়ের জন্যও ভালবাসে, (বুখারী)। পবিত্র কুরআনে মানব জাতিকে পরস্পর সদ্ভাব বজায় রেখে সুশৃঙ্খলভাবে জীবন নির্বাহ করতে বলা হয়েছে (সূরা আনফাল ঃ ২৩)। কেননা সদ্ভাবেই প্রকৃত মঙ্গল নিহিত (সূরা নিসা ঃ ১২৯)। ন্যায় ও সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত মু'মিন-মুত্তাকীগণের প্রতি ঐশী-নির্দেশ হচ্ছে তারা যেন স্ব স্ব জাতির প্রতি সহানুভূতিতে সদা উৎসাহী থাকে। কখনো ক্লান্ত না হয় (৪ঃ১০৫)। তবে বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষাবলম্বন করে লড়াই করতে নিষেধ করা হয়েছে (৪ঃ১০৬)। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে। 'যারা বিশ্বাসঘাতকতা' হতে নিবৃত্ত হয় না খোদাতাআলা সেই বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে ভালবাসা রাখেন না" (৪ঃ১০৮)।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে ভারতের কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হওয়ার দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেছেন, "সমগ্র মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আমাদের মূলনীতি। যদি কেউ দেখতে পায় যে, তার প্রতিবেশী হিন্দুর বাড়ীতে আগুন লেগেছে এবং সে আগুন নিভাইতে তার সাহায্যার্থে অগ্রসর হচ্ছে না, তাহলে আমি সত্য সতই বলছি যে, সে আমা হতে নয়। আমার অনুসারীদের মধ্যে যদি কেউ দেখে যে, কেউ এক খৃষ্টানকে হত্যা করছে এবং সে তাকে বাঁচাবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে না। তাহলে আমি সঠিক বলছি যে, সে আমা হতে নয়" (রূহানী খাযায়েন ১২ খন্ড, ২৮ পৃঃ)। তিনি আরো বলেন, "আমি সকল মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু ও আর্যদের নিকট এ কথা প্রকাশ করছি যে, দুনিয়াতে আমার কোন শত্রু নেই। আমি মানব জাতিকে এরূপে ভালবাসি যেরূপে এক স্নেহময়ী মাতা তার শিশুকে ভালবাসে, বরং তা হতেও বেশি। আমি কেবল মাত্র মিথ্যা মতবাদের শত্রু যা সত্যের বিনাশ ঘটায়। মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আমার কর্তব্য এবং মিথ্যা, শির্ক, অত্যাচার এবং প্রত্যেক অসদাচরণ হতে অসন্তুষ্ট হওয়া আমার ধর্ম" (ঐ, ১৭ খন্ড, ৩৪৪ পৃঃ)।

মহানবী বিশ্বনবী সরদারে দু'আলম নবী সম্রাট খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর প্রিয় অনুসারী মুসলমানদিগকে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ঐশী জামাতে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত লোকদের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন অপরাধ করে বসে যার জন্য তাকে বদলা দিতে হবে অর্থাৎ বিনিময়ে পণ দিতে হবে; আর সেই পণের টাকা দিতে যদি সে সমর্থ না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তার মহল্লাবাসী বা তার শহরবাসী বা তার জাতি তার পক্ষে ঐ পণের টাকা পরিশোধ করবে। অনেকেই ধর্মের খেদমতের জন্য প্রিয় নবী (সঃ)-এর নিকট আসা-যাওয়া করতো। তিনি তাদের উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং ওদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখে। মহানবী (সঃ)-এর যামানায় একবার দুই ভাই এ সাথে মুসলমান হ'ল। এক ভাই হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর কাছেই থেকে গেল। এবং অপর ভাই তার নিজের কাজে-কর্মে ফিরে গেল। কাজ-কর্ম করা ভাইটি একদিন ভাইয়ের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করলো যে, এ অকর্মা ভাইটি বসেই থাকে কোন কাজই করে না। প্রিয় নবী (সঃ) বলেছেন, 'এমন কথা বলতে নেই। আল্লাহ্তাআলা এরই উছিলায় তোমাকেও (রিযক) খাদ্য-বস্ত্র দিচ্ছেন। কাজেই এর খেদমত করবে এবং একে ধর্মের সেবায় ছেড়ে দাও' (তিরমিযী)।

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এক সফরে যাচ্ছিলেন। অনেক দূর পরিভ্রমণের পর এক নিরাপদ স্থানে তিনি তাবু গাড়লেন। এবং সাহাবারাও ময়দানে ছড়িয়ে পড়লেন যাতে শিবির স্থাপন করা যায় এবং প্রয়োজনীয় জিনিস -পত্র সংগ্রহ করা যায়। সাহাবাগণ (রাঃ) নিজেরা পরস্পরের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, তোমরা তো আমার জিম্মায় কোন কাজ রাখলে না। আমি লাকড়ি সংগ্রহ করে আনবো যাতে করে রান্না - বান্নার কাজ করা যায়। সাহাবারা (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরাই তো আছি কাজের জন্য আপনার আবার কাজ করার দরকার কি? তিনি (সঃ) বললেন, 'না, না এটা আমার কর্তব্য যে, আমিও কাজে অংশ গ্রহণ করি। বস্তুত তিনি জঙ্গল থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে আনলেন যাতে সাহাবারা খাদ্য-দ্রব্য রান্নার কাজ করতে পারে [যুরকানী, খন্ড, ৪ দ্রষ্টব্য মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ৪০ পৃঃ]। নবী করীম (সঃ)-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে প্রগতির পথে চলতে হবে। ধর্মের প্রচার ও প্রসারে হাত পা গুটিয়ে বসে না থেকে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত হবে না এবং স্থায়ী সফলতাও অর্জন করা যাবে না। পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্যের পতাকাবাহী অল্প সংখ্যক লোকই ইচ্ছে করলে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই এ ভূমন্ডলে একটা পবিত্র পরিবর্তন সূচিত করার জন্যে অল্প সংখ্যক লোকই যথেষ্ট। সংখ্যাধিক্যের দ্বারা এ পরিবর্তনের শুভ সূচনা ঘটবে কিনা সন্দেহ। তাই অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা চাই। একটা সুনির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে দায়িত্ব ও কার্যাবলী সীমাবদ্ধ রাখলে হয় না। সর্বব্যাপী সত্যের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে এবং তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়তে হবে। ঐশী জামাতে যারা নেতৃত্বের আসন ঐশী খেলাফতের বরকতে লাভ করেছেন তারা মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও আশীষ লাভে ধন্য। তাঁরা সত্যিই মর্যাদাবান ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইলাহী জামাতে বিভিন্ন পদে দায়িত্বপ্রাপ্তগণ বিশেষ মর্যাদায় অভিসিক্ত বলেই গণ্য হয়। কাজেই মহান খলীফার গতিশীল নেতৃত্বে ধারাক্রমে নেতার অনুবর্তিতা করে এগিয়ে যেতে হবে। আমীর, প্রেসিডেন্ট কায়েদ ও অঙ্গ-সংগঠনের সদরদের আনুগত্য মেনে নিতে পিছ পা হলে হবে না। তবে ঐশী জামাতে ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়ে উপনীত ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ইলাহী জামাতে একতা, সংহতি, সুভাতৃত্ববোধ, শৃঙ্খলা যাতে সর্বদা বজায় থাকে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধজনিত কোন ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে।

- আমীর মাহমুদ ভুঁইয়া

ফুলের তোড়া

(গুলদাস্তা)

[১০ থেকে ১৩ বছর বয়সে ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক]

(২৪তম ও শেষ কিস্তি)

জন্মদিন কীভাবে পালন করবে?

মা ঃ আজ তুমি জন্মদিন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেছো। সে সময় আমি কিছু ব্যস্ততায় লিপ্ত ছিলাম। এখন এস আমার কাছে বস। কেবল সকালের প্রশ্নের জবাবই দেব না বরং এখনও যদি তোমার মনে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হয় তাহলে ওগুলোও জানতে চাইতে পারো।

প্রথম কথা তো এই, যদি আমাদের নিকট সীমিত পরিমাণে কোন জিনিষ থাকে আর এক এক করে শেষ হতে থাকে তাহলে আমরা কি খুশী হবো। যেমন, খামের মধ্যে চকোলেট বা থলি থেকে টাকা এ হিসাবই বয়সের বেলায় খাটে। বয়স নির্দিষ্ট। যে সনটি চলে যায় আমাদের বয়স থেকে ১টি বছর কমে যায়। এতে খুশীর কিছুই থাকতে পারে না। আমরা যে পার্টি দিই, কেক খাই, উপহার নিই। দ্বিতীয় কথা তুমি এটা জিজ্ঞেস করেছিলে যে, খৃষ্টান, হিন্দু, পারসী ও অন্যান্য মুসলমান সারা বিশ্বে জন্মদিন পালন করে থাকে। আমরা কেন এটা পালন করি না। এর উত্তর এই ঃ হাদীস শরীফে লেখা আছে, যে ব্যক্তি যে জাতির রীতি-নীতি অবলম্বন করবে তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হবে। যেমন, একটি গোষ্ঠীর মাঝে খৃষ্টানদের তিন খোদার মান্যকারী যদি কেউ দাঁড়ায়, এক গোষ্ঠীর মাঝে হিন্দুদের মূর্তি পূজাকারী, এক গোষ্ঠীর মাঝে আল্লাহ্‌তাআলাকে মান্যকারী, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে ভালবাসে এমন এক গোষ্ঠী দাঁড়ায় তাহলে তুমি অবশ্যই ঐ দলে দাঁড়ানো পসন্দ করবে যারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দলভুক্ত হবে। এদলের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে তাদের পদ্ধতির ওপরে চলতে হবে যারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পদ্ধতির ওপরে চলে। জন্ম দিনের রুসুম পালন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের রীতিতে নেই। তাঁর (সঃ) এবং তাঁর সন্তানদের জন্মদিন কখনও পালন করা হয় নি। খুলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য সাহাবাগণের জন্ম দিন কখনও পালন করা হয় নি। আর শ' শ' বছরের মাঝে মুসলমানদের মাঝে এ রুসুম পাওয়া যায় না। উপমহাদেশে ইংরেজদের আসার সাথে সাথে এ রুসুম চলে আসে। আর তাদের অনুকরণে আরও অনেক রুসুম সৃষ্টি হয়েছে। এটাও তেমনি একটি। এতে হিন্দুদের কিছু রুসুম যুক্ত হয়। আজকাল শিশুদের জন্মের ওপরে, বিয়ে-শাদী উপলক্ষ্যে এবং কারও মৃত্যু উপলক্ষ্যে যেসব রুসুম-রেওয়াজ পালিত হয় অধিকাংশই পরবর্তীকালের সৃষ্ট। খোদাতাআলার শোকর যে, আমরা এ যুগের মাহ্‌দীকে মান্য করেছি যাঁকে ধর্মের মাঝে থেকে ভুল-ত্রুটি দূর করার কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। এখন আমাদের সামনে তাঁর পদ্ধতি বিদ্যমান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্মদিন কখনও পালিত হয় নি। তাঁর সন্তানদের, আমাদের প্রিয় খলীফাগণের জন্মদিনও পালন করা হয় নি। বর্তমান খলীফা হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ও তাঁর সন্তানদেরও জন্মদিন পালন করা হয় নি। এখন তুমি নিজে ভেবে দেখো এ রুসুম পালন করা উচিত, কি উচিত নয়।

সন্তান ঃ কিন্তু অন্যদেরকে বুঝানো খুবই কঠিন।

মা ঃ কোন কঠিন নয়। তুমি বলো আমরা এক - অদ্বিতীয় খোদাকে মান্য করি। আমাদের প্রত্যেক কাজ খোদাতাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে হওয়া আবশ্যক। খোদাতাআলাকে সন্তুষ্ট করার সকল প্রকারের পদ্ধতি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সবচে' বেশি জানতেন। তাঁর (সঃ) পরে খোদাতাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নতুন কোন পদ্ধতি কেউ বলতে পারে না। যদি কোন নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় তাহলে তা হবে ধর্মে নব সংযোজন। কেবল জন্মদিনের রুসুমই নয় এমন আর কোন রুসুম যা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সাব্যস্ত হয় না তা সঠিক হতে পারে না। আর এগুলো পালন করাও অনর্থক। লোকেরা জন্মদিন এজন্যে পালন করে না যে, আল্লাহ্‌তাআলা খুশী হবেন। বরং এজন্যে যে, লোকে কি বলবে? বা অমুক অমুক পালন করে আমরা কেন পালন করবো না। তুমি চিন্তা করে দেখবে জন্মদিন পালনে কত অর্থ ব্যয় হলো। একদিক থেকে চিন্তা করলে অযথাই অর্থ ব্যয় হলো। এটা কোন উত্তম কাজে লাগানো যায় যেমন, ধর্মের সেবায় বা কোন গরীবের সাহায্যের খাতিরে করলে অনেক পুণ্য হবে। সব শিশুরাই তো জন্মদিন পালন করতে পারে না। কোন কোন গরীব শিশু দেখে দেখে আফসোস করতে থাকে। যারা আগে থেকেই গরীব তাদের প্রাণে দুঃখ দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সন্তান ঃ যদি ধনী হয় আর টাকা-পয়সা থাকে তাহলে পালন করতে পারে?

মা ঃ এটা কেমন প্রশ্ন হলো? যারা গরীব আর পালন করতেই পারে না তারা পালন না করলে কি ইহা পুণ্য হবে। আর যারা ধনী, অর্থ কড়ি রয়েছে কিন্তু নিজ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর পথে চলার পুণ্য লাভ করার জন্যে পালন না করে। এটাই তো আসল পুণ্য। অনাড়ম্বর জীবন গড়ার মাঝে অনেক উপকার রয়েছে। সাদা-সিদা থাকবে তাহলে সন্তুষ্টচিত্তে পুণ্য কাজে অর্থ ব্যয় করতে পারবে।

সন্তান ঃ তাহলে আমি জন্মদিন কীভাবে পালন করবো?

মা ঃ ঐসব দিন পালন করা হয় যেগুলো ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্ব বহন করে থাকে। জন্মের তারিখ প্রত্যেক বছর অবশ্যই আসবে এ দিনটি অন্যান্য দিনের মতই। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার শোকরিয়া আদায় করা খুবই আবশ্যক। কেননা, তিনি সারা বছরটি উত্তম ও স্বস্তিতে কাটিয়ে দিয়ে থাকেন। আগামী বছরটি আরও ভাল হওয়ার জন্যে দোয়া করবে। অনেক সদকা দেবে। কেননা, তিনি ভালভাবে বছরটি কাটিয়ে দিয়েছেন। আরও দোয়া করবে যেন জীবনে প্রত্যেক আগামী দিনটি বিগত দিনের চেয়ে অধিক সফলতা বয়ে নিয়ে আসে। আমিও সব আহমদী সন্তানদের জন্যে এ দোয়া করি।

খোদার আশিসের ছায়া সদা তোমাদের 'পরে থাকুক প্রতিদিন বরকতমন্ডিত হোক আর প্রতি রাত উত্তম কাটুক (আমীন)।

কয়েকটি উপদেশ

(১) পড়ার সময় বই খানাকে ১ ফুট দূরে রাখবে

(২) দুর্গন্ধপূর্ণ মোজা থেকে রোগ ছড়ায়। মোজা ও পা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।

(৩) ধারাল বস্তু কানে বা মুখে ঢুকাবে না।

(৪) ভাল হাতে নিজের সামনে থেকে খাবার খাবে।

(৫) খাবার ও পান করার জিনিষে ফুঁ দিবে না।

(৬) ছোট বড় সকলকে আগেই সালাম দিয়ে দিবে।

(৭) চিরুনী করার পরে চুলকে চিরুনী থেকে বের করে কোন কাগজ বা খামে মুড়িয়ে পাত্রে রেখে দিবে।

(৮) সভা-সমিতিতে বসে নাকে আঙ্গুল প্রবেশ করানো এবং নখ কাটা পসন্দনীয় কাজ নয়।

(৯) নিজের পকেট খরচ থেকে সামান্য-সামান্য জমিয়ে গরীবকে সাহায্য করো।

(১০) নিজেদের সভা-সম্মেলনে অবশ্যই শামেল হবে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ আল্‌হাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

সন্তানের চরিত্র গঠনে আনসারের দায়িত্ব

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও" (৬১ঃ১৫) এখানে আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হবার নির্দেশ প্রদান করেছেন। বস্তুত সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী যে আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে, নিজেকে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকে। বরং সে শুধু নিজেই খোদামুখী হয় না। নিজ পরিবার, সমাজ এবং জাতিকে খোদামুখী করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকে। এর জন্য যে জান-মাল দিয়ে জেহাদ করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখে। আল্লাহ্ ইহাই চান বা এটাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। যাঁরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে এগিয়ে আসেন তাঁরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী, তাঁরাই আনসারুল্লাহ্।

প্রত্যেক মু'মিনই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী, কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (রাঃ) ৪০ বৎসরের উর্ধ্বে আহমদীদের সংগঠনের নাম আনসারুল্লাহ্ রেখেছেন। এর এক বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথমতঃ ৪০ বৎসর বয়সে মানুষের ভিতর তার বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ ঘটে ও জ্ঞানের পরিপক্কতা আসে। ফলে তার ভিতর ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। তখন সে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে পরিচালিত করার শক্তি অর্জন করে।

পবিত্র কুরআন পাক হতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন, "অতঃপর যখন সে পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং ৪০ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তওফীক দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। যা তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দান করেছ এবং (তওফীক দাও) যেন আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও এবং আমার জন্য আমার বংশধরগণের মধ্যেও পুণ্য প্রতিষ্ঠিত কর নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত" (৪৬ঃ১৬)।

দ্বিতীয়ত ঃ ৪০ বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়সের মানুষ সন্তানের পিতা বা দাদা নানা হবার ফলে পরিবার প্রধানের সমাজের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এজন্য তাঁদের পরিবার বা সমাজ গড়ার সুযোগ থাকে।

যেহেতু সন্তানগণ তাদের পিতা বা আনসারদের উপর নির্ভরশীল এবং সাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত পিতা তাদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন, সেহেতু সন্তানদের প্রতিপালনের সাথে চরিত্র গঠনের দায়িত্ব ও তাঁদের উপর ন্যস্ত।

প্রশ্ন আসতে পারে, খোদ্দামগণ তো সন্তানদের পিতা হয়ে থাকেন এবং সন্তানদের তরবিয়ত দানের দায়িত্ব তো তাদের উপরও পড়ে। এর উত্তর এই, আনসারা যেমন পিতা, তদ্রূপ দাদা-নানা ও বটে এবং কর্মময় থাকা পর্যন্ত বাড়ীর প্রধান হিসাবে পরিবারের সকলের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তাদের উপরই থাকে। খোদ্দাম পিতারা যদি তাদের সন্তানদের সঠিক পথে চালাতে ভুল করে তবে আনসাররা তাদের উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা দিতে ও সকলকে সঠিক পথে চলার ব্যবস্থা করতে পারে।

যদি সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালিত করা না যায় তবে তারা খোদার পথ হতে দূরে সরে যাবে এবং বিপথগামী হবার ফলে তারা গৃহের তথা সমাজের দুষ্ট -ক্ষত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে পড়বে। বর্তমান সময়ে সারা বিশ্ব যে নৈতিক অবক্ষয়ের চরম সীমায় পৌছেছে, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আজ সমাজের কিশোর-যুবকদের ভিতর অপরাধ প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। খুন, রাহাজানি, নারী নির্যাতন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মূলকারণ মানুষের ভিতর ধর্মীয় অনুভূতির অভাব। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের সঠিকপথে পরিচালিত করতে আজ অসমর্থ, সন্তানদের শৈশব কাল হতে উপযুক্তভাবে গড়ে না তোলার ফলে আজ যুব সমাজ হয়ে পড়েছে উচ্ছৃঙ্খল ও অবাধ্য। তাই আজ সমাজে অসামাজিক কাজ যেমন ছিনতাই, রাহাজানী চাঁদাবাজী ধর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শত চেষ্টাতেও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

মানব বুদ্ধির বিকাশের শুরু হতেই অর্থাৎ ৭ বৎসর বয়স হতেই সন্তানদের ধাপে ধাপে বিভিন্ন সংগঠনে যুক্ত হবার নির্দেশ প্রদান করেন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)।

তিনি বলেছেন, "আমি মনে করি, প্রত্যেক যুবক যে খোদ্দামুল আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বয়সের কিন্তু সে তাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি, সে সামাজিক অপরাধ করেছে। আবার যে ব্যক্তি এমন যে বয়স তো তার চল্লিশের উপর, তথাপি সে আনসারুল্লাহ্ মজলিসের অন্তর্ভুক্ত হয় নি, তাহলে সে-ও গুরুতর এক সামাজিক অপরাধ করেছে। আবার এক বালক যার আতফালুল আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বয়স, তবুও তার বাবা মা তাকে আতফালুল আহমদীয়া মজলিসের অন্তর্ভুক্ত করে নি, তাহলে তার বাবা-মাও এক সামাজিক অপরাধ করেছে" (মাশয়ালে রাহ্)।

শৈশবাবস্থা হতেই অর্থাৎ আতফালুল আহমদীয়া সংগঠন হতেই শিশুদের সংগঠনের মাধ্যমে সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু এ সংগঠনের শিশুদের অভিভাবক কখনও পিতা বা কখনও দাদা-নানা, যেহেতু এদের সংশোধনের যথাযথ ভূমিকা তাদেরই রাখতে হবে। শিশুকাল হতেই সন্তানদের সঠিকভাবে পরিচালিত না করতে পারলে বড় হলে তারা পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে পড়ে। তখন আফসোস করা ছাড়া তাদের করার আর কিছুই থাকে না।

এদিকে দৃষ্টি দিয়েই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেছেন, "আমাদের যে তরবিয়ত সংক্রান্ত বড় বড় কাজ সমাধা করতে হবে তা সাধিতই হতে পারে না, যদি না প্রাথমিকভাবে এ মৌলিক উপাদান তৈরী হয়। উপাদান যদি প্রস্তুত থাকে তবে তার উপর যত ইচ্ছা কাজ করতে পারেন, যত ইচ্ছা তাকে সাজাতে পারেন। কিন্তু মাটিই যদি নরম না হয় এবং তার মধ্যে রূপান্তরিত হবার ক্ষমতাই যদি না থাকে তবে যত বড় (পারদর্শী) শিল্পই হোক না কেন, সে উক্ত মাটিকে আর সুন্দর আকারে সাজাতে পারবে না" (তরবিয়তের গোড়ার কথা)।

তিনি আরও বলেছেন, "সেহেতু আমি অনুভব করছি যে, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত শৈশবকাল হতে আমাদের সন্তানদের আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা না দেই ততক্ষণ পর্যন্ত ভবিষ্যতকালে বড় হয়ে তাদের সৎ ভূমিকার জামানত দেয়া যেতে পারে না। শৈশবকালে যদি সন্তানদের উপযুক্ত তরবিয়ত দেয়া যায় তবে খোদ্দাম ও লাজনার বয়স হলে তারা নিজেরা দায়িত্ব সচেতন হবে এবং জাতি উপযুক্ত চরিত্রবান ব্যক্তি লাভ করবে এবং তারা নিজেদের সন্তানদেরও সামাজিক জাতীয় ও ধর্মীয় চাহিদানুযায়ী গড়ে তুলতে পারবে।

ঠিক এ কথাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেছেন, তিনি বলেছেন, "অতএব যার যতটুকু অভাব আপনারা দূর করতে সক্ষম হন তা নিজেরা করুন এবং বাচ্চাদের দিয়ে করান। বাল্যকাল থেকে যদি এর অভ্যাস গড়ে উঠে, তাহলে ফলশ্রুতিতে বাচ্চারা যে স্বাদ অনুভব করবে তা এই নেকীকে স্থিতিশীলতা দান করবে। তারপর বড় হয়ে তারা খোদ্দামুল আহমদীয়তে গেলে অথবা লাজনার উপযোগী বয়সে উপনীত হলে সংগঠনগুলোকে আর তাদের ব্যাপারে পরিশ্রম করতে হবে না বরং জাতির জন্য গড়া ও তৈরী করা চরিত্রবান ব্যক্তিবর্গ অনায়াসে পাওয়া যাবে, যারা আবার বড় বড় সমস্যা সমাধার উদ্দেশ্যে নিজেদের স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রস্তুত দেখতে পাবে।" (ঐ)

পবিত্র কুরআন পাকে ও আল্লাহ্‌তাআলা সন্তানের অভিভাবকের উপর সন্তানের তরবিয়তের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের পরিবার - পরিজনদের

আগুন হতে রক্ষা কর" (৬৬ঃ৭)। এখানে 'আহল' বলতে পরিবারের সদস্যদের বুঝায় যার মধ্যে সন্তানগণও পড়ে। আর সন্তান বলতে নিজের সন্তানই নয়, সন্তানের সন্তানগণও বুঝায়। অধীনস্থ হিসাবে তারা যাদের অভিভাবক।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, তোমরা নিজেরাই শুধু তাঁর শিক্ষা মত চলবে না। তোমার 'আহল' বা পরিবারের সদস্যদেরও ঐশী শিক্ষায় শিক্ষিত করে খোদার প্রকৃত বান্দা হিসাবে গড়ে তুলবে। অন্যথায় তোমাদের সকলকেই দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে। কেননা আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলাই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

ইবাদতের অর্থ ব্যাপক। নামায, রোযা, ইত্যাদি ইবাদতের অংশ। প্রকৃতপক্ষে ইবাদত বলতে আল্লাহ্তাআলার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পালন বুঝায়। অতএব আনসার বা সন্তানের অভিভাবকদের মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাদের তরবিয়ত বা শিক্ষা দান করতে হবে।

সন্তানদের যদি শিশু কাল হতে ধর্মীয় অনুভূতিশীল করে না গড়া যায়, তবে তারা খোদা-ভীরু হবে না। আর খোদা-ভীরু না হলে তারা আল্লাহ্র ইবাদত হতে দূরে থাকবে, ফলে নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিবে। পরিণামে পরকালে তাদের অবস্থান হবে জাহান্নাম। শুধু তাই নয়, ইহকালকেও তারা জাহান্নাম সৃষ্টি করে দিবে। অশান্তির আগুনে অন্যদের জ্বালাবে।

সন্তানগণ আল্লাহ্র নিয়ামত। আর সন্তান তখনই নিয়ামতরূপে গণ্য হবে যখন সে নিজ পরিবার সমাজ, জাতি বা দেশের উপকারে আসবে। যখন সে সকলের সুখ ও সমৃদ্ধির কারণ হবে। এর বিপরীত হলে পিতা বা অভিভাবকদের আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহী করতে হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, "অতঃপর সেদিন তোমরা (তোমাদেরকে প্রদত্ত) নিয়ামত সম্বন্ধে, অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে" (১০২ঃ৯)।

সন্তানদের খোদামুখী করে গড়ার এ নীতি হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইয়াকুব (আঃ)ও গ্রহণ করেছিলেন। কুরআন পাকে বলা হয়েছে, "এবং এ বিষয়ে ইব্রাহীম নিজ সন্তানদেরকে পূর্ণ তাকিদ করল এবং ইয়াকুবও, (এই বলে) 'হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় থাকা ব্যতিরেকে আদৌ মৃত্যুবরণ করবে না" (২ঃ১৩৩)।

হযরত রসূলে করীম (সঃ) ও সন্তানদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য পিতাদের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "কোন পিতা তার পুত্রকে উত্তম শিষ্টাচার অপেক্ষা আর কিছু দান করতে পারে না" (তিরমিযী)। অন্য এক হাদীস হতে জানা যায় যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে তাদের শিশুকাল থেকে উপযুক্তভাবে লালন-পালন করে সে বিচার দিবসে আমার সঙ্গে আঙ্গুলের ন্যায় অবস্থান করবে" (মুসলিম)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সন্তানদের তরবিয়ত দান সম্পর্কে বলেন, "অতঃপর নিজে নেক আদর্শ স্থাপন কর, নিজের সন্তান-সন্ততিদের জন্য একটি নেক ও খোদা-ভীরুর উৎকৃষ্ট আদর্শ হয়ে যাও, তাদেরকে মুত্তাকী ও ধর্মপরায়ণ করবে। চেষ্টা কর ও দোয়া করে যাও। তাদের জন্য ধন-সম্পদ জমানোতে যত পরিশ্রম কর এ ব্যাপারেও ততখানি চেষ্টা কর" (মলফূযাত ঃ ৬ খন্ড)

তিনি এ-ও বলেছেন, "কোন কোন লোক মনে করে যে তারা তাদের সন্তানদের জন্য ধন-সম্পদ রেখে যেতে চায় কিন্তু তারা সন্তাদের উত্তম চরিত্রবান করতে চায় না এবং তারা অসৎ চরিত্রহীন সন্তান রেখে যায়। এ সম্পর্কে কোন চিন্তাই করে না"(মলফূযাত, ৮ম খন্ড)।

মজলিসে আনসারুল্লাহ্র স্থপতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেছেন, "শিশুদের তরবিয়তের ব্যাপারে পিতা-মাতা প্রথম হতেই যেন এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে যাতে তাদের ঘরের মধ্যে খারাপের তুচ্ছতা সম্পর্কে কোন ধারণা সৃষ্টি না হয় অর্থাৎ তারা যেন খারাপকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে। বহু পিতামাতা আছে যারা চাহে যে, তাদের সন্তানদের উপর কোন খারাপ প্রভাব সৃষ্টি না হয়, কিন্তু বাচ্চাদের সামনে তারা এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাতে বাচ্চারা খারাপ হতে তুচ্ছ জ্ঞান করতে শিখে এবং এর ফলে তাদের মনে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ পিতামাতা সাধারণভাবে এটাই চায় যে তাদের বাচ্চারা মিথ্যা কথা না বলুক। কিন্তু নিজেরাই বাচ্চাদের সামনে মিথ্যা কথা বলে ফেলেন" (পাক্ষিক আহমদী, ৩১শে আগষ্ট ১৯৭৩)।

উপরের উদ্ধৃতিসমূহে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) আমাদের এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, সন্তানদের চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে হলে আমাদের নিজেদের আগে আদর্শ ও চরিত্রবান হতে হবে। আমাদের কথায় ও কাজে মিল থাকতে হবে সেই কথা স্মরণ হয় যার মূল কথা হচ্ছে, যে নিজে চিনি খায় সে অন্যের চিনি খাওয়া বন্ধ করবে কীভাবে?

অতএব সন্তানদের চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে হলে গৃহে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা শিশুকাল হতেই খোদা সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এজন্য বাড়ীতে সন্তানদের নিয়ে বাজামাত নামায আদায় করতে হবে। গৃহে ইসলামী রীতি-নীতি চালু করতে হবে। সালাম-কালামের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রতিদিন ফজরে কুরআন পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের ছোট থেকেই জাগতিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। এভাবে গৃহে যদি ধর্মীয় পরিবেশ গড়ে উঠে তবে শিশুদের ভিতর ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হয়ে তারা খোদা-ভীরুতে পরিণত হবে এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকবে।

একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সন্তানদের শুধু পুণ্যবান করার ইচ্ছা থাকলেই চলবে না, আন্তরিক প্রচেষ্টাও থাকতে হবে। এ প্রচেষ্টা তখনই কার্যকর হবে যখন এর সঙ্গে খোদার ইচ্ছা যুক্ত হবে। কেননা, খোদার ইচ্ছা না হলে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ নিজেও বলেছেন, "মানুষ যা চায় তা কি পায়?" (৫৩ঃ২৫)। এজন্যই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের প্রচেষ্টার সাথে দোয়া জারি রাখতে বলেছেন (উপরের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-ও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "মানুষ যদি সফলকাম হতে চায়, তার কর্তব্য বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহ্তাআলার নিকট দোয়া করা কিন্তু দোয়ার সাথে তার সংকল্প এবং স্পৃহা সংযুক্ত হওয়া উচিত। তবে দোয়া ফলদায়ক হবে" (জুমুআর খুতবা ২২শে অক্টোবর, ১৯৪৩ই)।

আল্লাহ্তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অসীম দয়াবান। সে জন্য তিনি সন্তানদের জন্য দোয়াও আমাদের শিখিয়েছেন। যেমন তিনি শিখিয়েছেন, **'রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া জুররিআতিনা-কুররাতা আইউনি ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা'** অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদের মুত্তাকীদের ইমাম বানাও" (২৫ঃ৭৫)।

হাদীস শরীফে এসেছে যে, সন্তানদের জন্য পিতার দোয়া কবুল হয়। অতএব প্রচেষ্টার সাথে আমাদের এ সকল দোয়া জারি রাখা হবে।

অতএব আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, আল্লাহ্র শুধু অন্যের সাহায্যকারীই নয়, সে তার সন্তান-সন্ততিদের সাহায্যকারী। তার উপর শুধু সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্বই ন্যস্ত নয়, তাদের খোদা-ভীরু ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলার দায়িত্ব ও তাদের একজন আনসার শুধু তখনই নিজেকে প্রকৃত আনসার বলে দাবী করতে পারবে যখন তার সন্তানগণ সমাজে সৎ ও চরিত্রবান বলে পরিচিত হবে।

আল্লাহ্ আমাদের এরূপ আনসার হবার তৌফীক দিন, আমীন।

- খোন্দকার আজমল হক

তোমরা তোমাদের মৃতদের ভালভাবে স্মরণ করো - আল হাদীস

মরহুম মোহর আলী মাস্টার

মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ খোদাতাআলার অতি প্রিয় হয়ে থাকেন। জাগতিক লোভ-লালসা ও সংসারের মোহমুক্ত এসব ব্যক্তি স্বর্গীয় আনন্দে নিমজ্জিত থাকেন। তাঁদের লোভ একমাত্র খোদার সন্তুষ্টির দিকে। এ জগতের বাসিন্দা হয়েও তাঁরা অন্য এক ভুবনে বিচরণ করেন। ধর্ম জগতের অমানিশার অন্ধকার রাতে তাঁরা উজ্জ্বল তারকাসম হয়ে থাকেন। তাঁদের জ্ঞান ও চরিত্রের আলোকে সম সাময়িক সমাজ সংসার আলোকিত হয়ে থাকে।

তেমনি একজন আলোকিত ব্যক্তি ছিলেন মরহুম জনাব মোহর আলী মাষ্টার। রমজান বেগ, মুন্সীগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং এদেশের একজন প্রবীণতম আহমদী ছিলেন তিনি। আজ থেকে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে তাঁর সাথে অন্তরঙ্গ কিছু আলাপচারিতার সুযোগ লাভ করেছিলাম। আজকের নিবন্ধখানি সেই আলাপচারিতার ভিত্তিতে রচিত।

১৯৬৯ সাল। মেট্রিক পাশ করে হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জে ভর্তি হয়েছি। সে সময় মরহুম মোহর আলী মাস্টার সাহেবের পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নতুন এ আত্মীয় বাড়িতে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। তখন এ প্রবীণ ব্যক্তিত্বের সাথে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ লাভ করি। তাঁর শিশুসুলভ সরল মন, ফুলের মত পবিত্র চেহারা এবং ফিরিশ্‌তাতুল্য নির্মল হাসি আমাকে যাদুর মত আকর্ষণ করত। মোটা কাঁচের চশমার আড়ালে দু'টি মায়াবী চোখ এবং দন্তবিহীন সুখের নির্মল হাসি আজও চোখের সামনে ভাসে! ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ইং তারিখের আলাপচারিতার উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষ ডায়রীতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম। তাঁর জীবনের অনেক চকমপ্রদ ঘটনা এদেশের আহমদীয়তের ইতিহাসের অংশ এবং আমাদের ঈমানের দৃঢ়তার কারণ হবে তাই এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তা' তুলে ধরা হ'ল।

জনাব মোহর আলী মাস্টার মরহুম ১৯২১ইং সনে মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুল থেকে ২য় বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। সে হিসাবে আনুমানিক ১৯০৬ অথবা ১৯০৭ইং সনে তাঁর জন্ম। ছেলে বেলা থেকেই তাঁর মনের একটি একান্ত খেয়াল ছিল আল্লাহ্‌র ইবাদত করা। তিনি প্রায়শই হিমালয় পর্বতের পাদদেশে অথবা কোন পীরের দরগায় গিয়ে খোদার আরাধনা করার কথা ভাবতেন। এজন্য তিনি এক পীরের মুরীদও হয়েছিলেন। সেই পীর ছিলেন, পীর শের আলী, আখাউড়া, যিনি ঢাকার পরীবাগে থাকতেন। ধর্মীয় জ্ঞান লাভের আশায় বড় বড় মাওলানা- মৌলভীদের এলাকায় এনে ওয়াজ করাতেন এবং তাদের সেবা-যত্ন করতেন জনাব মাস্টার সাহেব।

একবার একটি ঘটনায় তাঁর সম্বিৎ ফিরে আসে। এরপর মাওলানাদের প্রতি তার মোহভঙ্গ ঘটে। তিনি এদের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। ঘটনা ছিল এরূপ - একবার লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত মাওলানা জনাব জহির উদ্দীনকে তাঁদের গ্রামে ওয়াজ করতে আনয়ন করেন। তখন গ্রামে অভাব-অনটন চলছিল। সেবার মাওলানা সাহেবকে ওয়াজ শেষে বেশি টাকা-পয়সা দেয়া সম্ভব হল না। অল্প টাকা দেয়ায় মাওলানা সাহেব সেই টাকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং টাকা ফেরৎ দিয়ে দেন। এ ঘটনা জনাব মাস্টার সাহেবের দৃষ্টি খুলে দেয়। সেদিন থেকে তিনি সংসার লোভী মাওলানাদের পিছু ত্যাগ করেন।

জনাব মোহর আলী মাস্টার অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ও সমাজ সেবক ছিলেন। তিনি এলাকায় স্কুল, কবরস্থান ও মসজিদ স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতেন। বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর আগ্রহ ছিল সীমাহীন। যে কোন স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি হাজির হতেন এবং স্কুলে বই, খাতা ইত্যাদি দান করতেন। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের (চরকেওয়ার) মেম্বর থাকাকালীন খাসকান্দি গ্রামকে রমজানবেগ নামে মুন্সীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করান, যা বর্তমানে পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত।

তিনি একবার লৌহজং থানার দক্ষিণ চারিগাঁও নওয়াপড়া প্রাইমারী স্কুলে গমন করেন। মহকুমা শিক্ষা অফিসার এবং স্থানীয় এম এম এ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী সাহেবের সফর সঙ্গী হিসাবে তিনি সেখানে যান। ঐ স্কুলের ৫ম শ্রেণীর এক মেধাবী ছাত্রী টেলেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছিল। সেই সফরের সময় উক্ত ছাত্রী অংক করে সবাইকে চমক লাগিয়ে দেয়। জনাব বিক্রমপুরী সাহেবের মধ্যস্থতায় জনাব মাষ্টার সাহেবের সাথে ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ বাং উক্ত মেধাবী ছাত্রী নূর জাহান বেগমের বিয়ে হয়। এটা ছিল জনাব মাষ্টার সাহেবের ২য় বিয়ে। তাঁর প্রথম স্ত্রী এক কন্যা সন্তান রেখে ইন্তিকাল করেছিলেন।

জনাব মোহর আলী মাস্টার সাহেবের সত্যানুসন্ধানী মন কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছিল না। সে সময় তাঁর এক সহকারী বন্ধু তাঁকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর জাহির হওয়ার সংবাদ দেন। উক্ত ব্যক্তির নাম ছিল জনাব আকরম আলী মাষ্টার। তিনি জনাব মোহর আলী মাস্টার সাহেবকে বলেন- ইমাম মাহদী যে জাহির হয়েছে সেই খবর পেয়েছ কি? জনাব মোহর আলী জানতে চান কোথায় ইমাম মাহদী (আঃ) জাহির হয়েছেন? তখন জনাব আকরম আলী মাস্টার বললেন- কাদিয়ানের এক গ্রামে তিনি জাহির হয়েছেন। জনাব মোহর আলী মাস্টার সাহেব বললেন-কাদিয়ানীরা নাকি রসূল (সঃ) কে মানে না? তারা নাকি নিজেরাই খোদা দাবী করে? জনাব আকরম আলী সাহেব তখন বলেন, এ সবই মিথ্যা কথা। আমি ওদের হাদীসুল মাহ্‌দী নামক একখানি বই পড়েছি। আমার মনে হয় সত্যই ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) জাহির হয়েছেন। কথা শুনে জনাব মোহর আলী মাষ্টার সাহেব বিভিন্ন মৌলভী-মাওলানার কাছে যান এবং এ ব্যাপারে অনুসন্ধান শুরু করেন। তিনি ঢাকা গিয়ে বহু আহমদীর সাথে আলাপ আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে আরও জানার জন্য তিনি বহুবার ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ গিয়েছেন। এমন কি দু'বার তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়াও যান। এমনিভাবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি আহমদীয়তের সত্যতা উপলব্ধি করেন। একটি ঘটনা তাঁর মনে বেশি বিস্তার করে। সে ঘটনা হ'ল- জনাব মাওলানা নূরউদ্দীন আফ্রাদ সাহেবের আযান? নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেবের সুমধুর আযান শুনে তিনি পাগল প্রায় হয়ে যান। এমন প্রেমময় ও সুমধুর আযান তিনি জীবনে কখনো শুনেন নি। এ আযান শুনে তাঁর মনে হল- এ আযানে যদি খোদা না থাকেন তাহলে তার কোথাও খোদা নেই! অতঃপর তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্র হওয়ার বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ সনে বয়াত করে আহমদীয়া জামাতে শরীক হন।

বয়াত গ্রহণ করে পরের দিন তিনি নারায়ণগঞ্জ যান। সেখান থেকে মুন্সীগঞ্জ ফেরার পথে প্রথম মোখালেফাত শুরু হয়। মুন্সীগঞ্জ শহরে প্রবেশ করতে গেলে লোকজন তাঁকে বাধা দেয়। তারা বলে এ লোক কাফির হয়ে গেছে। তাঁকে শহরে ঢুকতে দেয়া হবে না। এ খবর পেয়ে মুন্সীগঞ্জ টাউন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরী এবং সেক্রেটারী জনাব টেপু কেরানী তখন সেখানে আগমন করেন। তাঁরা জনাব মাষ্টার সাহেবকে প্রশ্ন করেন- আপনার খোদা কে এবং রসূল (সঃ)-কে? জনাব মাস্টার সাহেব জবাব দেন, আপনাদের খোদাই আমার খোদা এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ই আমার রসূল। এ উত্তর শুনে জনাব বিক্রমপুরী সাহেব সকলকে ধমক দেন এবং জনাব মাস্টার সাহেবকে শহরে যেতে অনুমতি দেন। এমনিভাবে বিরোধিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনাব মাস্টার সাহেবের বড় মেয়ের জামাই গজারিয়ার বড় মাওলানা ফযল করিম সাহেবই সবচেয়ে বেশি মোখালেফাত শুরু করেন। মেয়ের জামাই তাঁর লাইব্রেরীর সামনে দাঁড়িয়ে লোকজনকে ডেকে ডেকে বলতেন "এই ব্যক্তি কাফির হয়ে গেছে, তাকে কতল করা দরকার।"

ক্রমশ বিরোধিতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মেয়ের জামাই মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে। এমনিভাবে তাদের উপর নানাভাবে নির্যাতন চলতে থাকে। মুন্সীগঞ্জ শহরে বিক্রমপুর লাইব্রেরী নামে জনাব মাস্টার সাহেবের বড় একটি বই এর দোকান ছিল। বিরুদ্ধবাদীরা এ লাইব্রেরী থেকে কাউকে বই - পত্র কিনতে দিবে না। চুপি চুপি কিছু বই বিক্রি করলেও রাস্তা থেকে বিরুদ্ধবাদীরা সেসব ক্রেতাকে বই ফেরৎ দিয়ে টাকা নিয়ে যেতে বাধ্য করত। এমন অবস্থা দীর্ঘ দিন চলতে থাকে। এমনও সময় গেছে যে, মাস্টার সাহেবের পরিবার দুই তিন দিন অনাহারে কাটাতে বাধ্য হন। বিরোধিতা আস্তে আস্তে চরমে পৌছে। একবার শহরে তিনটি দল গঠিত হয়। তারা এক রাতে মাস্টার সাহেবকে হত্যা করে ফেলবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। গোপনে সে সংবাদ তিনি জানতে পারেন। এমন কি বিকেলে লোকজন তাঁর দোকানের সামনে একথাও বলতে থাকে, "আজ রাতেই তোমাকে শেষ করা হবে।"কোন উপায়ান্তর না দেখে মাস্টার সাহেব রাতে লাইব্রেরীতেই থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। খোদার উপর ভরসা করে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি মরতে হয় তবে এ শহরের বুকেই যেন তাঁর লাশ পড়ে থাকে। সন্ধ্যায় পরিবারের লোকজন কেঁদে-কেটে তাঁকে লাইব্রেরীতে রেখে সবাই দেওভোগস্থ তাদের বাসায় চলে যায়। এদিকে সন্ধ্যা রাত্রেই মাস্টার সাহেব খোদার নাম স্মরণ করে শুয়ে পড়েন। তিনি এ ভেবে সন্ধ্যা রাত্রে শুয়ে পড়েন যেন গভীর রাতে জেগে থাকতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'ল- যখন মাস্টার সাহেবের ঘুম ভাঙ্গে তখন সকাল হয়ে গেছে। তিনি ভাবতেই পারেন নি যে, রাত ভোর হয়ে গেছে। তিনি ভয়ে ভয়ে দরজা খোলেন। তাড়াতাড়ি বাসার দিকে যাত্রা করেন। তাঁর মনে এ ভয়, হয়ত বাসায় কেউ আর জীবিত নেই। কিন্তু বাসায় গিয়ে দেখেন সবাই ঠিক আছে শুধু তাদের পালিত কুকুরটিকে মাথা কেটে হত্যা করে দরজার সামনে রাখা হয়েছে। মাস্টার সাহেবকে দেখে সবাই কেঁদে উঠেন এবং বলেন যে, সারা রাত তারা কেউ ঘুমাতে পারে নি। কিন্তু মাস্টার সাহেব বললেন, কীভাবে রাতটি কেটে গেছে তিনি তা টেরও পান নি।

মাষ্টার সাহেব ধর্ম প্রচারে থেমে থাকেন নি। অনেক বাহাসে অংশগ্রহণ করেন। একবার লক্ষ্মৌর সেই মাওলানা জহিরউদ্দীন সাহেবের সাথেও বাহাস হয়। মাওলানা সাহেব পবিত্র কুরআন থেকে নবীর আগমন প্রমাণ দিতে বলেন। তখন মাস্টার সাহেব বলেন যে, পবিত্র কুরআনে নবী আসবে না এমন কথা কোথাও লেখা নেই বরং "হে আদম সন্তানগণ! তোমাদের মধ্য হতে যখনই নবী আগমন করবে। এ কথা শুনে জহিরউদ্দীন মাওলানা সভা ছেড়ে চলে যান এবং মিসর থেকে তফসীর এনে দেখাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু তিনি তা কোনদিন দেখাতে পারেন নি।

অন্য একবার, বরিশালের বিখ্যাত মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেবের সাথেও বাহাস হয়। তিনিও নবীর আগমন কীভাবে সম্ভব তা জানতে চান। জনাব মাস্টার সাহেব উত্তরে বলেন, সূরা ফাতিহার আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন- আনআমতা আলায়হিম মাওলানা সাহেব আপনিই বলুন সেই নেয়ামত কী? একথা শুনে মাওলানা সাহেব বললেন, "আমার বুঝ হয়ে গেছে আমাকে আর বলতে হবে না"। সেদিন থেকে মাওলানা সাহেব জীবনের মত ওয়াজ ছেড়ে দেন।

জনাব মাস্টার সাহেব অত্যন্ত বন্ধু-বৎসল ছিলেন। আহমদীয়া জামাতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে তাঁর খুবই আন্তরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁরা হলেন- সর্বজনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, এ এইচ, আলী আনোয়ার, আল্লামা জিল্লুর রহমান, ডাঃ সামাদ খান চৌধুরী, মৌঃ আব্দুর রহমান খান বাঙ্গালী, ডাঃ মোঃ নূর হোসেন (রিকাবী বাজার) আব্দুল খালেক মুন্সী (নারায়নগঞ্জ) এবং আরও অনেকে।

জনাব মাস্টার সাহেব স্মৃতিচারণ করে বলেন, পূর্বে একজন আহমদী অন্য একজন আহমদীর সাথে মিলিত হলে বড় মহব্বতের সাথে একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং একে অপরকে নিজ নিজ সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনাতেন। কেউ বলতেন, তাঁকে ঘর থেকে বের হতে দেয় না। কেউ বলতেন, তাঁর জমির ফসল বিরোধীরা কেটে নিয়ে গেছে ইত্যাদি নানা কাহিনী। তাছাড়া ঈমানবর্ধক অনেক ঐশী নিদর্শন ও ঐশী সাহায্যের কথাও তাঁরা বর্ণনা করতেন। এ সব দৃশ্য এখন আর দেখা যায় না। এখন জামাত বৃদ্ধি পেয়েছে। আগের মত এত বিরোধিতাও নেই, ফলে আহমদীদের ত্যাগের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে বলে তিনি মনে করতেন।

জনাব মাস্টার সাহেব সম্পর্কে তাঁর এলাকার মানুষ অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। সবাই তাঁকে একজন সৎ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বলে সম্মানের চোখে দেখতেন। সারা জীবনে তিনি কারও কোন ক্ষতি করেন নি এবং কারও সাথে তাঁর কোন মনোমালিন্য ছিল না। তিনি ২৩শে এপ্রিল, ১৯৭৯ সনে এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে তাঁর প্রেমাস্পদ খোদাতাআলার কাছে চলে গেছেন। মৃত্যুকালে তিনি ৫ (পাঁচ) ছেলে যথাক্রমে সর্বজনাব মোঃ নুরুজ্জামান, মোঃ কামাল পাশা, মোঃ জাকারিয়া, মোঃ বাচ্চু মিয়া এবং মোঃ জিল্লুর রহমান এবং কয়েকজন কন্যা সহ তাঁর স্ত্রীকে রেখে যান যাঁরা বর্তমানে আহমদীয়া জামাতের একনিষ্ঠ খাদেম হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। পরিশেষে এ দোয়া করছি, আল্লাহ্‌ যেন মরহুম মাস্টার সাহেবকে বেহেশ্‌তের উচ্চ মোকাম দান করেন, আমীন।

- মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

(বিঃ দ্র ঃ মৃত বুযূর্গদের স্মৃতিচারণ সম্পর্কে আমরা আরো লেখা আহ্‌বান করছি - নিঃ সঃ)

হযরত আম্মাজান

(হামারি ছ'ছাল জামাতে আহমদীয়া, লাহোর)

"হার চাহ্ বায়েদ বো আরোছী রাহ্মা ছামা কুম ওয়ান চাহ্ মাতলোর সামাবামাদ আতায়ে আঁ কুম" (তাযকিরা)।

এগুলো সান্ত্বনার সেই বাণী যা কবিতাকারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ যা-ই নব বধূর জন্য দরকার সে সকল উপকরণের ব্যবস্থা আমি করব এবং সে সমস্ত দ্রব্যাদি যা তোমার প্রয়োজন হবে তা-ও আমি সরবরাহ করব।

যদিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চৌদ্দ পনর বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং মোহতরমা হুরমত বিবি সাহেবার পক্ষ থেকে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব এবং মির্যা ফযল আহমদ সাহেব নামীয় দুই পুত্র ছিল এবং হুযূর (আঃ)-এর বিয়ের কোন ইচ্ছাও ছিল না। যেমন হুযূর (সঃ) বলেন ঃ

"দ্বিতীয় বিয়ের আমার কোনই ইচ্ছা ছিল না। আর অবস্থাও এর অনুমতি দিচ্ছিল না। কিন্তু খোদার তক্দীর এবং ইচ্ছা অটল তক্দীর হিসাবে পরিদৃষ্ট হয় এবং দ্বিতীয় বিয়ে শুধুমাত্র খোদার আদেশে করা হয়। এ বিয়ের জন্য আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে বারবার আদেশ আসছিল এবং আরশ থেকে এ আওয়াজ আসেছিল যে, 'উয্কুর নি'মাতি রাযায়তা খাদি জাতি' এবং এ-ও ইলহাম হয় 'আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী জাআলাস্ সিহ্রা ওয়ান্নাসাবা"।

মহানবী রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ-ও আগমনকারী মসীহ্ (আঃ)-এর বিবাহ এবং সন্তানাদি সম্পর্কে "ইয়াতা যাওওয়াজু ওয়া ইয়ুলাদুলাহু" শব্দাবলী দ্বারা সংবাদ দেয়া হয়েছে। হযরত আকদস (আঃ) বলেন, "এ বিয়ে এবং সন্তানাদি বিশেষ করে নিদর্শনস্বরূপ।" নয়তো প্রত্যেক মানুষই বিয়েও করে থাকে আর সন্তানাদিও হয়ে থাকে। এ ভবিষ্যদ্বাণীকৃত বিয়ের ফলস্বরূপ সেই প্রতিশ্রুত সন্তানের জন্ম হয় যার ওয়াদা আল্লাহ্তাআলা মসীহ্ মাওউদের (আঃ) সাথে এ ভাষায় করেন-

তোমার অনেক বংশধর হবে। আমি তোমার বংশধরকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করব এবং বকরত দান করব ... কিন্তু কেউ কেউ এদের মধ্যে অল্প বয়সেই মারা যাবে। এবং তোমার বংশধর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে যাবে।"

হযরত সৈয়্যদা নূসরত জাঁহা বেগম যাকে জামাতে আহমদীয়া "আম্মাজান" এর মত ভালবাসাপূর্ণ নামে স্মরণ করা হয়। তিনি হযরত মীর নাসের সাহেব (রাঃ)-এর সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তিনি ১৮৬৫ সালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। একদিকে তিনি হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ সুফী খাজা মীর দরদ্ (রহঃ)-এর বংশের আদরের দুলালী এবং চোখের মণি ছিলেন। এবং অপরপক্ষে নানার দিকে মির্যা ফওলাদ বেগ ইরানীর সাথে বংশীয় ক্রমধারা সম্পৃক্ত হয়। হযরত মীর নাসের (রাঃ)-এর পূর্ববর্তী চল্লিশ পুরুষ এর বংশীয় ক্রমধারা হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর সাথে মিলে যায়।

হযরত আম্মাজানের প্রকৃত নাম নূসরত জাহাঁ বেগম-ই ছিল। কিন্তু পিতা নাম রেখেছিলেন আয়েশা। এবং প্রায়ই এ নামে ডাকতেন। বাড়ীর বৃদ্ধা মহিলারা "নাসীরুল জাঁহা" নামেও ডাকতেন। কিন্তু বিয়ের পরে তাঁর নাম "সৈয়্যদা নূসরত জাহাঁ" হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। হযরত নানাজান অর্থাৎ হযরত মীর নাসের নওয়াব (রাঃ) সাহেব বলেন,

"আমার ঘরে যখন এ মহীয়সী মেয়ের জন্ম হয় তখন আমার মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে যায় এবং আমি মরার মত খোদার দরবারে পড়ে যাই। আমি অনেক দরদের সাথে দোয়া করি, "হে খোদা! তুমি তার যাবতীয় ভার বহন করো।" অর্থাৎ ঐশী নিয়তি জন্মের সাথে সাথেই অসাধারণভাবে তার তাঁর জন্য দোয়ার ক্রমধারা শুরু করে দিয়েছিল।

হযরত আম্মাজান চারিত্রিক দিক দিয়ে উচ্চ পর্যায়ের ছিলেন। মেয়ে হিসাবে হোক বা বোন হিসাবে বা স্ত্রী হিসাবে হোক বা মা হিসাবে সব দিক দিয়ে তিনি ছিলেন হৃদয়হরা। আল্লাহ্র ইচ্ছাকে গ্রহণ করে নেয়ার মানসিকতা এত বেশি ছিল যে, পাঁচজন সন্তান অল্প বয়সে মারা যান কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুতির কোন লক্ষণ বা কথা মুখে শোনা যায় নি। এমনও হয়েছে বাচ্চারা শেষ সময় উপস্থিত তখন নামাযেরও সময় হয়েছে। তিনি বলেন, "এখন তার জীবিত থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। তাহলে আমি কেন আমার নামায নষ্ট করব?"

তারপর ধীরে-সুস্থে নামায আদায় করে বাচ্চার অবস্থা জিজ্ঞেস করে যখন এ জবাব পেতেন যে, মারা গেছে তখন আল্লাহ্র দরবারে ধৈর্য প্রদর্শন করে চুপ হয়ে যেতেন। এভাবে মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব যখন আট বৎসর বয়সে মারা যান তখন শুধুমাত্র এ কথাই তিনি বলেছিলেন,

"আমি খোদাতাআলার নিয়তিতে সন্তুষ্ট"- আল্লাহ্তাআলা তাঁর এ আচরণ ও প্রতিক্রিয়া এত পসন্দ করলেন যে, বর্ণিত হয়, আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। তখন হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত আম্মাজানকে নিঃসংকোচে বলতে থাকেন,

"আমি এ পবিত্র বাক্যে এত আনন্দিত যদি দুই হাজার মোবারকও মারা যেত তবুও কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না।"

হযরত আম্মাজানকে আল্লাহ্তাআলা দয়ার্দ্রচিত্ত করেছিলেন। আপন পর সকলের সুখ-দুঃখের খবরা-খবর রাখতেন। প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতিশীল, প্রত্যেকের গোপনীয়তার হিফাযতকারীণী, এতীমদের জন্য অকৃত্রিম ভালবাসা, বিধবাদের জন্য তিনি ছিলেন আশ্রয়স্থল। আর্থিক কুরবানীর ময়দানেও তিনি ছিলেন অগ্রগামী।

লাজনার সর্বপ্রথম অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। প্রথম চৌদ্দজন সদস্যার মধ্যে তাঁর নাম এক নম্বরে ছিল। লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রকৃত উদ্দেশ্যাবলী এবং উদ্বোধনী ঘোষণায় তাঁর স্বাক্ষরের শব্দগুলো ছিল -

"উম্মে মাহমুদ নূসরত জাঁহা বেগম।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হৃদয়ে তাঁর জন্য যে সম্মান এবং স্থান ছিল তার বর্ণনা হুযূর (আঃ)-এর ভাষায় বর্ণনা করে এ প্রবন্ধ শেষ করছি -

"যেহেতু খোদাতাআলার ওয়াদা ছিল পরিচর্যাকারী সৃষ্টি। আমার বংশধর থেকে এক উচ্চ পর্যায়ের ধর্ম পরিতোষণকারী তৈরী করবেন এবং তার মধ্য থেকে সে সত্তার জন্ম দিবেন যার মধ্যে অলৌকিক প্রাণ সত্তা থাকবে। এজন্য তিনি পসন্দ করেছেন যে, ঐ বংশের মেয়েকে আমি বিবাহ করি এবং তার মাধ্যমে সেই সন্তানের জন্ম দেই যে, সেই নূরগুলো যা আমার দ্বারা রোপিত হয়েছে, পৃথিবীতে বেশি বেশি করে ছড়িয়ে দিবে। এবং এটা

আশ্চর্যজনক মিল যেভাবে সৈয়্যদ বংশের মূল দাদীর নাম সহরবানু ছিল, সেভাবে আমার এ স্ত্রী যে ভবিষ্যদ্বংশধরের মা হবে তার নাম নূসরত জাহাঁ বেগম। এটা শুভাশুভ লক্ষণস্বরূপ নির্ণয়ের সেই কথার দিকে ইঙ্গিত যে, আল্লাহ্‌তাআলা সমস্ত পৃথিবীর সাহায্যকল্পে আমার বংশধরের ভিত্তি রেখেছেন। এটা আল্লাহ্‌তাআলার নিয়ম যে, কখনো নামের মধ্যেও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী লুকায়িত থাকে।"

জামাতে আহমদীয়ার প্রিয় ও দয়ার্দ্রচিত্ত মা রাবওয়ায় ২০শে এপ্রিল, ১৯৫০ সনে স্বীয় দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক সন্তানদেরকে ছেড়ে স্বীয় মাওলার দরবারে চলে যান। তাঁর দাফন বেহেশ্‌তী মাকবেরা রাবওয়ায় সম্পন্ন হয়। আল্লাহ্‌তাআলার হাজারো রহমত কিয়ামতকাল অবধি তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আমীন।

আম্মাজানের ভাষায় আল্লাহ্‌তাআলার কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও দোয়া

আমার উপর তোমার দয়া বড় আশ্চর্য, হে খোদা

হে রাজ্যাধিপতি। কীভাবে তোমার শুকরিয়া আদায় করবো।

এক মুহূর্তের জন্যও তুমি আমা থেকে বিচ্ছিন্ন হও নি

আমার এ দেহের সমস্ত অণু-পরমাণু তোমাতে উৎসর্গীকৃত।

আপাদমস্তক আমার উপর তোমার দয়া

আমার উপর সর্বদাই তোমার রহমতের ফোঁটা বর্ষিত হয়েছে।

তুমি এ বিনয়াবনতাকে চারটি ছেলে দিয়েছ

এগুলো তোমার পুরস্কার এবং তোমারই অনুগ্রহরাজি।

প্রথম জন মাহমুদ চতুর্থ মোবারক

দু'জনের মধ্যে রয়েছে বশীর এবং শরীফ।

তুমি প্রথম থেকেই এ চারজনের সুসংবাদ দিয়েছিলে

তুমি সেই আদেশদাতা যাঁর আদেশ কখনো রদ হয় না।

হে প্রিয়! তোমার অনুগ্রহরাজীর বর্ণনা করা থেকে কীভাবে বিরত থাকবো?

হে প্রিয়! আমার উপর যে তোমার অসংখ্য অনুগ্রহরাজি

আমাকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছ তুমি

দীন এবং দুনিয়ায় আমার উপর তোমার অনুগ্রহরাজি বর্ষিত হয়েছে

কোন ভাষায় শুকরিয়া করব তোমার, সে ভাষা কোথায়?

কারণ আমি নগণ্য এবং তোমার রহমতের পিয়াসী

তুমি আমার উপর যে অনুগ্রহ করেছো তা কল্পনার অতীত

তুমি বিরাট সত্তার অধিকারী তোমার প্রসাদ পবিত্র এক জগৎ!!

স্বীয় মসীহ্‌র জন্য আমায় বেছে নিয়েছ

হে আমার প্রিয়! আমার উপর এটাই তোমার দয়ার প্রথম ধাপ। (দূররে সামীন)।

অনুবাদ - **মোহাম্মদ এহ্‌সানুল হাবীব (জয়)**

মুসলিম আইনে মোহরানার ভূমিকা

বিয়ের জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন হয়, তার মধ্যে মোহরানা অন্যতম। কারণ এ ছাড়া ইসলামিক ধর্মমতে কোন বিয়ে হতে পারে না।

মোহরানা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যা স্বামী তার স্ত্রীকে বিয়ে উপলক্ষ্যে উপহারস্বরূপ দেয়।

পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ৫ম ও ২৫নং আয়াতে বলা হয়েছে, "মোহরানা এক দেনা এবং অবশ্য পরিশোধযোগ্য।" একই সূরার ২৬নং আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা আদেশ দেন, "কোন কৃতদাসীকে বিয়ে করলে তাকেও মোহরানা দিয়ে দাও।"

হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) একবার এক দরিদ্র লোকের জন্য তার রূপোর আংটি মোহরানা হিসেবে ধার্য করেছিলেন। অন্য আরেকটি হাদীসে পাওয়া যায়, একজন দরিদ্র সাহাবীর জন্য তার স্ত্রীকে কুরআন সেখানোই ছিল তার জন্য মোহরানা।

মোহরানা পাত্রীর ধার্মিকতা, বিচক্ষণতা, বয়স, সৌন্দর্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। তবে এক্ষেত্রে পাত্রীর পরিবারের সামাজিক মর্যাদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আহমদীয়া জামাতের রেওয়াজ অনুযায়ী পাত্রকে অন্ততঃ তার ছয় মাস থেকে এক বছরের আয় মোহরানা হিসেবে দিতে হবে।

ইসলামিক আইনের একটি ধারণা অনেকেরই অজানা যা "Hiba-Al-Mahro" নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে স্বামী প্রথমে অবশ্যই তার মোহরানা পরিশোধ করবেন। কিন্তু যদি পরবর্তীতে স্বামীর আয় বৃদ্ধি পায় তাহলে স্বামী তার স্ত্রীর মতামত নিয়ে অনুপাত অনুযায়ী এর পরিমাণ বাড়াতে পারেন।

Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর Sec-10 এ বলা হয়েছে, যদি মোহরানার পরিমাণ বা পরিশোধ পদ্ধতি সম্পর্কে কাবিন নামায় কিছু বলা না হয়ে থাকে, তবে পরিমাণ অনুমান করে সেটি পরিশোধ করতে হবে।

আপনাদের মধ্যে অনেকে হয়তো জানেন মোহরানা দিতে হয় দু'টি ভাগে। বিয়ের সময় যে মোহরানা দিতে হয় তা Specified Dower হিসেবে পরিচিত। এটা আদায়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার এত বেশি যে, স্বামী যদি মোহরানা ৩ বছরের মধ্যে পরিশোধ না করেন তবে স্ত্রী মামলা দায়ের করতে পারেন। অথবা ইচ্ছা করলে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারবেন।

পরে স্বামী যদি স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ না করা অবস্থায় মারা যান, তাহলে মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার যারা থাকবেন; তারা তাদের অংশ মোতাবেক এটা পরিশোধ করবেন।

যদিও একটি বিষয় আমার বক্তব্যের অন্তর্গত নয়, তারপরেও সম্পর্কিত বলে বলছি।

বিয়ে উপলক্ষ্যে অনেকে বাহুল্য খরচ করে থাকেন। তার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ, আতশবাজী, নাচ, গান, এবং ভোজ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সকল প্রকার বাজে খরচকে হারাম বলেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আমাদের কওমের মধ্যে ইহা এক মারাত্মক প্রথা যে, বিয়ে উপলক্ষ্যে শত শত টাকা বাজে খরচ করা হয়। স্মরণ রাখিও যে, লোক দেখানোর জন্য বড়াই করিয়া আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা, ইহার আদান - প্রদান ও খাওয়া উভয়ই শরীয়ত

অনুযায়ী হারাম। আতশবাজী, বাইজী, ভেড়ুয়া, ডোমবাদকদের উপর খরচ করা সমস্তই হারাম। ইহাতে অযথা খরচ হয় এবং পাপ মাথার উপর চাপে" (ফাতাওয়া, মসীহ্ মাওউদ ১৪৫ পৃষ্ঠা)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আইঃ) বলেন, "পাত্রীর বাড়ীতে বিবাহ ভোজ নিষিদ্ধ। পাত্রপক্ষ যদি দূর হতে আসে, তাহলে বিনা দাওয়াতে, বিনা ঘটা বা চুক্তিতে যেরূপ মুসাফিরকে অভ্যর্থনা করা হয় সেরূপ তাদেরকে আহার্য দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ উপলক্ষ্যে পাত্র পক্ষ ভোজের দাবী করলে সেটি বিদা'ত হবে কিংবা এ উপলক্ষ্যে যখন মুসাফিরের অভ্যর্থনা দেয়া হয় তখন ঐ অভ্যর্থনায় পাত্রীর খান্দানের কাউকে দাওয়াত দিলে সেটি বেদাত হবে।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর এসব বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত"।

যৌতুকের কুফল ঃ যৌতুক সমস্যা আমাদের দেশের জন্য একটি সামাজিক সমস্যা। ইসলামে যৌতুক প্রথা বলে কিছু নেই। এটি সম্পূর্ণ বিদা'ত।

হযরত রসূলে করীম (সঃ) কন্যার পক্ষ থেকে তার পিতার নিকট দাবী রাখেন যে, সে তারা কন্যাকে পুত্রের ন্যায় শিক্ষা দিবে এবং স্বামীর নিকট তার দাবী যে, সে স্ব গৃহে স্ত্রীকে প্রথম ওলীমার ভোজ দিবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন, "বিবাহে কোন পক্ষই অপরের নিকট হতে আল্লাহ্তাআলা এবং তাঁর রসূলের দাবী দাওয়াসমূহ ব্যতিরেকে অন্য কোনরূপ দাবী -দাওয়া করতে পারবে না। সেচ্ছায় যে পক্ষ যা দিতে চায়, তাতে নিষেধ নেই।

Dowry Prohibition Act-1890 এর Sec-3 তে বলা হয়েছে যৌতুক দেয়া বা নেয়া হলে ১-৫ বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। অন্যদিকে যৌতুক দাবী করলে ১-৫ বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।

ইরেজীতে একটি Proverb আছে, "The earth can satisfy a needy man but not a greedy man".

একথাগুলো যদি সবাই মেনে চলেন তবে এ ধরনের বক্তব্য পরবর্তীতে আর প্রয়োজন হবে না আর যদি মেনে না চলা হয় তবে পরবর্তীতে এ বিষয়ে কিছু বলা নিরর্থক হবে।

- তাহেরা আনোয়ার স্মৃতি

জামাতের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ বাণী

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

খোদা জামাতের প্রাণে যুগ-খলীফার জন্যে এমন ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন যে, তা তার দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে

রমযানের পবিত্র মাসে দোয়া করুন যেন আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করেন

আমার প্রিয়রা! আহমদীয়তের অস্তিত্বতুল্য বৃক্ষের সবুজ-শ্যামল শাখাগুলো!! (তোমাদের ওপরে আল্লাহ্র শান্তি ও কল্যাণ এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক)। আমার অসুখের সময় আপনারা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে যে অস্থিরতা ও আন্তরিক ব্যথা-বেদনা নিয়ে আমার সুস্থতার জন্যে দোয়া করছেন আর আমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে যে প্রীতিপূর্ণ চিঠি-পত্র বারবার লিখেছেন, ফোন-ফ্যাক্স করেছেন আমি তার জন্যে সবার নিকট কৃতজ্ঞ।

এটা খোদাতাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি জামাতের প্রাণে যুগ-খলীফার জন্যে এমন ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন যে, তা তার দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং সব রকমের দুঃখ-কষ্ট ভুলে তার জন্যে দোয়ায় নিবেদিত হয়।

যারা আমার জন্যে দোয়া করেছেন আল্লাহ্ আপনাদের সকলকে তাঁর বিশেষ আশিস ও অনুগ্রহ দ্বারা মন্ডিত করুন। সর্বদা আপনাদেরকে ও আপনার প্রিয়দেরকে তাঁর কৃপার ছায়ার নীচে আশ্রয় দিন।

আপনাদেরকে প্রত্যেক দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা-করুন এবং প্রত্যেক কৃপা ও প্রত্যেক আনন্দ আপনাদেরকে দান করুন। আমীন- যেন তা-ই হয় হে সবচে' উত্তম কৃপাকারী!

রমযানের পবিত্র মাস আরম্ভ হয়েছে। এ মাস দোয়ার কবুলীয়তের মাস। এ কল্যাণমন্ডিত মাসে নিজেদের ও আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া করুন-অনেক দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করেন। তিনি আমাদের ওপরে যে দায়িত্বাবলী অর্পণ করেছেন আর যে কর্তব্যসমূহ পালন করার জন্যে তিনি আমাদেরকে দাঁড় করিয়েছেন আমরা যেন সেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকারীতে পরিণত হই। আর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও ত্যাগের সাথে ওগুলো পালন করতে সচেষ্ট হই।আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আমাদের তুচ্ছ পরিশ্রম ও ত্যাগ গ্রহণ করুন এবং ধর্মের বিজয়ের জন্যে তাঁর সেসব প্রতিশ্রুতি আমাদের চোখের সামনে পুরো করে দেখান যা তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের সাথে করেছেন। আর বিভ্রান্ত মানবতাকে আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পথ দানকারী ছায়ার নীচে নিয়ে আসেন, আমীন।

অসুখের এসব দিনে আপনাদের সাথে আমার সেসব ভাইয়েরাও রয়েছেন যারা এখনও জামাতভুক্ত হন নি। তারাও আমার সুস্থতার জন্যে দোয়া করেছেন এবং স্বাস্থ্যের খবরা-খবর নিয়ে বাণী পাঠিয়েছেন। আমি তাদের সকলের প্রতিও কৃতজ্ঞ। আমি অন্তর থেকে তাদের এ সদাচরণের মর্যাদা দিচ্ছি। আল্লাহ্তাআলা তাদের অনুগ্রহের প্রতিদান দিন। তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিন এবং নিজ আশিস দ্বারা মন্ডিত করুন, আমীন। আমি আপনাদের কাছ থেকেও আশা করছি যে, আপনারাও তাদেরকে আপনাদের দোয়ার বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন।

আমার প্রভু-প্রতিপালক সব সময় আপনাদের সাথী হোন! আপনাদের সাথী হোন! আপনাদের সাথী হোন! তার আদর ও কৃপা এবং তাঁর সন্তুষ্টিমাখা দৃষ্টি সর্বদা আপনাদের ওপর থাকুক। আপনারা সর্বদা তাঁর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার নীচে থাকুন আর আমার প্রভু-প্রতিপালক কখনও আপনাদের কষ্ট আমাকে না দেখান। আমীন, সুম্মা আমীন। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক তুমি এমনই করো! (নভেম্বর ৯, ২০০২)। (১৩-১১-২০০২ তারিখের আল্ ফযলের সৌজন্যে)।

অনুবাদ ও উপস্থাপন - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও এর পূর্ণতা

ভূমিকা ঃ

আমরা জানি না, কিন্তু ভবিষ্যতে অবশ্যই ঘটবে এরকম কোন ঘটনাকে যে বাণীর মাধ্যমে পূর্বেই জানিয়ে দেয়া হয় তা হলো ভবিষ্যদ্বাণী। ভবিষ্যদ্বাণী অনেকেই করে থাকেন। গণক, জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করে। তারা অনুমান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আর কিছু অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সারা জীবনে অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। যার হাতে গণা কয়েকটি কাকতালীয়ভাবে পূর্ণ হলেও এর অধিকাংশই অপূর্ণ থাকে বা মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হয়।

অন্যদিকে নবী রসূলগণও ভবিষ্যদ্বাণী করেন। আর এর ভূমিকাতেই বলে দেন যে, এ ঘোষণা আমার নিজের পক্ষ থেকে নয়। এটি অদৃশ্য বিষয়ের সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে জানিয়েছেন। এ কারণেই দেখতে পাই, নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো মুহূর্ত, ঘন্টা, দিন, মাস, যুগ, শতাব্দী ও সহস্রাব্দের গন্ডি পাড়ি দিয়েও অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়।

নবী আর জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর এটি হলো একটি পার্থক্য। নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার নিশ্চয়তা স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন-

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۝

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ

يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۝

অনুবাদ ঃ তিনিই অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কারও উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না, এমন রসূল ছাড়া, যাকে তিনি মনোনীত করেন। অতঃপর নিশ্চয়ই তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একদল প্রহরী (ফিরিশ্‌তা) পরিচালনা করেন, (সূরা জিন্ন ঃ ২৭, ২৮)।

অর্থাৎ নবীগণ যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জেনে, কোন অদৃশ্য বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন আল্লাহ্‌তাআলা তা বাস্তবায়ন করার জন্য ফিরিশ্‌তা নিয়োগ করে দেন। ফলে তা যথা সময়ে বাস্তবায়িত হয়। এ নবীগণেরই একজন ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর গোলাম (উম্মতী নবী) ও ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তিনি ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের নাম না জানা, অখ্যাত, গন্ডগ্রাম কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার পর, তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জেনে অগণিত ভবিষ্যদ্বাণী জগদ্বাসীর সামনে করে গেছেন। এগুলো অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও হবে। এখানে তাঁর (আঃ) কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী ও এর পূর্ণতার চিত্র তুলে ধরা হলো।

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ঃ

আজ থেকে একশ' বছর পূর্বে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) তাঁর জামাত ও বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করে, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করার অগণিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যার সত্যতা আজ দিবালোকের মত উদ্ভাসিত। এর মাঝে বিশেষ কয়েকটি হলো ঃ

ভবিষ্যদ্বাণী (১) ঃ

আমি তোমার তবলীগকে (প্রচার) পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছে দিব" (তাযকিরা)

দেখুন, আজ থেকে প্রায় একশ' বছর পূর্বে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আর তখন তাঁর অবস্থাটা কী ছিল একবার চিন্তা করেন। একদিকে গন্ডগ্রাম কাদিয়ান। যার গায়ে তখন গিয়ে লাগে নি আধুনিক সভ্যতার আলো। যাতে ছিল না টেলিফোন, টেলিগ্রাম, বিদ্যুৎ, রেল গাড়ির মত আধুনিক কোন যোগাযোগ মাধ্যম। অন্যদিকে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য বিরুদ্ধবাদী মোল্লা, আর্য সমাজী, শিখ, খৃষ্টানদের সম্মিলিত আক্রমণ ছিল। তখন তাঁর (আঃ) এ ঘোষণা যেমন বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছিল অসম্ভব তেমনি বিরুদ্ধবাদীরা এ নিয়ে করেছিল হাসি-বিদ্রূপ।

কিন্তু মানুষ চিন্তা না করতে পারলে কী হবে! আলীমুল গায়েব আল্লাহ্‌তাআলা তা ঠিকই জানতেন। আমরাও আজ অবাক-বিস্ময়ে দেখছি কীভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে ও হচ্ছে। যেখানে প্রথম দিন হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর হাতে ৪০ জন লোক বয়াত করেছিল সেখানে আজ তাঁর খলীফার হাতে এক বছরে ৮ কোটি ১০ লক্ষ লোক বয়াত করছে। তাঁর (আঃ) মৃত্যুর সময় জামাতের সদস্য ছিল ৪ লক্ষের মত। আজ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ কোটিতে। এছাড়া আজ জামাত বিশ্বের ১৭০টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ১৫ হাজারেরও বেশি মসজিদ জামাতের হাতে এসে গেছে। প্রায় ৬০টি ভাষায় কুরআনের পূর্ণ অনুবাদ ও ১২০টি ভাষায় আংশিক অনুবাদ জামাত প্রকাশ করেছে। ১৭টি ভাষায় ৭৯টি পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছে বিভিন্ন দেশে। পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশেই আহমদীয়ত ছড়িয়ে গেছে, হাজার হাজার মুবাল্লীগ ও নিষ্ঠাবান আহমদীগণ তবলীগ করে যাচ্ছেন। আফ্রিকার নিগ্রো, অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী, ইউরোপের সাদা চামড়ার মানুষ, বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের কাছেও জামাতের দাওয়াত পৌছে গেছে। যেখানে আমরা পৌছাতে সক্ষম হই নি সেখানে ১৯৯২ সালে MTA (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া) চালু হওয়ার পর আহমদীয়তের দাওয়াত পৌছে গেছে। এখন MTA ২৪ ঘন্টা বিশ্বের কোণে কোণে ইসলাম প্রচার করে চলেছে। এর ফলে আজ পৃথিবীর জল, স্থল, আকাশ এর কোন জায়গা বাহ্যিকভাবে অবশিষ্ট নেই যেখানে আহমদীয়তের তবলীগ পৌছাচ্ছে না। এভাবে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী একশ' বছরের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করেছে।

ভবিষ্যদ্বাণী (২) ঃ

"খোদা চান যে, ইউরোপ বা এশিয়া তথা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পবিত্রচেতা ব্যক্তিদের তৌহীদের দিকে আকর্ষণ করেন এবং আপন ভক্তগণকে একই ধর্মে একত্রিত করেন। এ আমার উদ্দেশ্য যেজন্য আমি প্রেরিত হয়েছি" (আল্ ওসীয়্যত)।

"দেখ ঐ যুগ আসছে। বরং নিকটে এসে গিয়েছে, যখন আল্লাহ্‌তাআলা এ সিলসিলাহ্‌কে পৃথিবীতে অত্যন্ত বরণীয় করে তুলবেন। এটি পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে প্রসার লাভ করবে এবং দুনিয়ায় ইসলাম বলতে একমাত্র এ সিলসিলাকেই বুঝাবে। এ সেই আল্লাহ্‌তাআলার বাণী, যার কাছে কোন কিছু অসম্ভব নয়"(তোহফায়ে গুলড়াবীয়া)।

"এখন সেই দিন নিকটে এসে যাচ্ছে যখন সভ্যতার সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে' (তাযকিরা)।

"I shall give you a large party in Islam"

অনুবাদ ঃ আমি তোমাকে ইসলামের একটি বিশাল জামাত দান করবো।"

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে এশিয়া, ইউরোপ এবং উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম দ্বারা আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, নরওয়ে এবং প্রশান্ত, ভারত ও আটলান্টিক মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শেষ ভবিষ্যদ্বাণীটি ইংরেজীতে হওয়ার মাধ্যমে এ ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে, ইংরেজী ভাষাভাষী লোকদের মাঝে আহমদীয়ত ছড়াবে এবং তাদের একটি বড় জামাত থাকবে।

আজ একশ' বছর পর আমরা লক্ষ্য করছি এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পূর্ণতার উজ্জ্বল চিত্র। আজ আফ্রিকার দেশগুলোতে আহমদীয়ত ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। এর অনেক দেশে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক আহমদী হচ্ছে। আফ্রিকায় আহমদীদের পরিমাণ আজ ১০ কোটিকে ছাড়িয়ে গেছে। ইউরোপের ইংল্যান্ড, জার্মানী, সুইডেন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, বসনিয়ায় বড় বড় জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তারা আজ সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের কাজ করে যাচ্ছে। লন্ডন জামাতে আজ রয়েছেন খলীফা ও তাঁর অস্থায়ী কার্যালয়। যেখান থেকে সারা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে। ইউরোপে কত বড় জামাত আছে তা ২০০১ সালের জার্মানীর জলসায় ৫০ হাজার আহমদীর উপস্থিতিই প্রমাণ করে। এছাড়া আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ায়ও জামাত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেছে। ইউরোপ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার সবচে' বড় মসজিদ আজ জামাতে আহমদীয়ারই রয়েছে।

রাজা-বাদশাদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

রাজা বাদশাদের সম্পর্কেও হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। যার কয়েকটি হলো ঃ

ভবিষ্যদ্বাণী (১) ঃ

"বাদশাগণও তোমার বস্ত্র হতে আশিস অন্বেষণ করবে" (তাযকিরা ১৪২ পৃঃ)

এ ভবিষ্যদ্বাণীও অসংখ্যবার পূর্ণ হয়েছে এবং হয়ে চলছে। সর্বপ্রথম ১৯৬৫ সালে গাম্বিয়ার রাষ্ট্র প্রধান আলহাজ্জ স্যার, এফ এম সিংঘাটে দ্বারা পূর্ণ হয়। তাকে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর এক টুকরা কাপড় দেয়া হয়। এরপর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের আরেক বাদশাকে কাপড়ের টুকরো দেয়া হয়েছে। ২০০১ সালে বেনীনের এক বাদশা, যিনি বাদশাদেরও বাদশা, তিনি আহমদী হন এবং জার্মানীর জলসাতে যোগদান করেন। তাঁকে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর এক টুকুরো কাপড় দেয়া হয়।

ভবিষ্যদ্বাণী (২) ঃ

"হায়! নাদিরশাহ্ কোথায় গেল"? (তাযকিরা)

এ ভবিষ্যদ্বাণীটি ১৯০৫ সালে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) সারা জগতকে জানিয়ে রাখেন। তখন নাদিরশাহ্ ছিলেন আফগানিস্তানের বাদশা। এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাস্বরূপ ১৯৩৩ সনের ৮ই নভেম্বর আব্দুল খালেক নামে এক যুবকের গুলিতে তিনি নিহত হন। আর তখন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় হেড লাইন (শিরোনাম) আসে-হায়! নাদিরশাহ্ কোথায় গেলেন? ২৮ বছরের ব্যবধানে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে।

ভবিষ্যদ্বাণী (৩) ঃ

"কিসরার রাজ প্রাসাদে ভূমিকম্প সংঘটিত হবে" (তাযকিরা)।

এ ভবিষ্যদ্বাণী ১৯০৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী করা হয়। তখন ইরানের বাদশাহ্ ছিলেন মোজাফফর উদ্দিন শাহ্। তিনি দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় বাদশাহ্ ছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি ৫৫ বৎসর বয়সে মারা যান। তার পুত্র মির্যা মুহাম্মদ আলী ইরানের বাদশাহ্ হন। তিনিও পিতার মত জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা পার্লামেন্ট ভবনে আক্রমণ করে। বাদশাহ্ ১৯০৯ সালের ১৫ই জুলাই সিংহাসন ত্যাগ করে রাশিয়ার দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রথমবার পূর্ণ হয়। দ্বিতীয়বার আয়াতুল্লাহ খোমেনী কর্তৃক বাদশাহ্ রেজা শাহ্ পাহ্লভীর সিংহাসনচ্যুত হওয়ার মাধ্যমেও এটি পূর্ণ হয়।

ভবিষ্যদ্বাণী (৪) ঃ

"অচিরেই জারের (রাশিয়ার সম্রাট) জন্য ক্রন্দন বা বিলাপের অবস্থা সৃষ্টি হবে।" (তাযকিরা)

এ ভবিষ্যদ্বাণীর পর ১৯১৭ সালের ১৪ই আগষ্ট রাশিয়ার সম্রাট (দ্বিতীয় নিকোলাস) সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিদ্রোহীরা তাকে, তার স্ত্রী, কন্যা, পুত্র ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে বন্দী করে অমানসিক নির্যাতন ও নিপীড়ন করে। পরে ১৯১৮ সালের ১৬ই জুলাই তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এর ফলে বাহ্যিকভাবে যা অসম্ভব ছিল তা-ই সম্ভব হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে।

দেশ ও জাতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতি সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এর কিছু তুলে ধরা হলো ঃ

ভবিষ্যদ্বাণী (১) ঃ

"প্রথমে বাঙ্গালা সম্পর্কে যা কিছু হুকুম জারি করা হয়েছিল, এখন তাদের মনোতুষ্টি করা হবে" (তাযকিরা)।

এটি ছিল বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬ সালে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এ ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ১৯০৫ সালে তৎকালীন দিল্লীর গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন বঙ্গ দেশকে দুইভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট এর অনুমোদন করে। এতে বাঙ্গালীরা ক্ষিপ্ত হয়। সারা দেশে বিক্ষোভ ও দাঙ্গা শুরু হয়। বৃটিশ সরকার কঠোর হস্তে তা দমন করে। তখন মসীহে মাওউদ (আঃ) এ ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং ১১ই ডিসেম্বর, ১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ আদেশ রহিত করার ফরমান জারি করেন। এভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে।

ভবিষ্যদ্বাণী (২) ঃ

"হে কাবুলের মাটি! তুমি সাক্ষী থাক যে, তোমার উপর এ রকম অমানসিক অত্যাচার সংঘটিত হলো। হে হতভাগা দেশ! তুমি খোদার দৃষ্টিতে কোপান্বিত হয়েছ, কেননা, এ ভূমিতে এরূপ চরম যুলুমের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়েন)।

১৯০৬ সালে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়েন পুস্তকে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরে আজ পর্যন্ত একের পর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ কাবুলের মাটিকে রক্তাক্ত করে চলেছে। ১৯৩৩, ১৯৭১, ১৯৭৮, ১৯৭৯ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন বাদশাদেরকে পরিবারসহ হত্যা করে অন্য একজন ক্ষমতা দখল করে। ১৯৭৯ সালে জেনারেল বাবরক কারমাল ১ লক্ষ রাশিয়ান সৈন্যের সহায়তায় কাবুলে রক্ত ঝড়িয়ে ক্ষমতা দখল করেন। পরে রক্ত ঝরিয়ে আবার আমেরিকাপন্থী তালেবান সরকার রাশিয়াকে বিতাড়িত করে ক্ষমতা দখল করে। তখন ক্ষমতাচ্যুতদের সাথে তাদের যুদ্ধ লেগেই ছিল। ২০০১ সাথে আবার কাবুলের মাটিকে রক্তে রঞ্জিত করে তাদের পতন হয়। এ ঘটনার এখনও শেষ হয় নি। আজও স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে কাবুলের মাটিতে রক্ত ঝরছে। আজ কাবুলের মাটিতে, মহিলা, শিশুদের আর্তনাদ শুনারও কেউ নেই। এভাবে ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে চলেছে।

ভবিষ্যদ্বাণী (৩) ঃ

"হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি এবং জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য দেখতে পাচ্ছি। সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁর সম্মুখে বহু অন্যায় সংঘটিত হয়েছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করে গিয়েছেন। এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক। ঐ সময় দূরে নয়।

... আমি সত্য সত্য বলছি যে, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে।"

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) ১৯০৬ এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো করেছিলেন। আজ আমরা ২০০২ সালে দাঁড়িয়ে দেখছি কতভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। এরপরও দেশে দেশে (কাশ্মীর, ইরাক-আমেরিকা, ... তালেবান, ইরাক-ইরান দুই কোরিয়া, বসনিয়া, রুমানিয়া, আলজেরিয়া, ভারত-পাকিস্তান, বাংলাদেশ পাকিস্তান, রাশিয়া-আফগানিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র-ভিয়েতনাম আরও অনেক দেশ) যুদ্ধ হয়েছে এবং হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা আর নাগাসাকি ধ্বংস হয়েছে। এ ছাড়া অন্য যুদ্ধগুলিতেও দেশ জনপদগুলো জনশূন্য হয়েছে ও হচ্ছে। এ প্রায় একশ' বছরে অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগও পৃথিবীতে আপতিত হয়েছে। অনেক ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধ্বস বন্যা, খরা, তুষারপাত পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ভয়ঙ্কররূপে আঘাত হেনেছে। শুধু অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা ধরলেও আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, নিউইয়র্ক সিটির কথা উল্লেখ করা যায়। আর প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবে বাংলাদেশের বন্যা, ইউরোপের ও অষ্ট্রেলিয়ার বন্যা, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার দাবানল, গুজরাট ও ইরানের ভূমিকম্প উল্লেখ করা যায়। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার পরিসংখ্যান বিস্তারিত দিতে চাইলে তা অনেক দীর্ঘ বর্ণনা হবে।

ইসলামী নীতি-দর্শন পুস্তক সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

"ইহা সেই সন্দর্ভ, যা সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে" (ইশ্‌তিহার ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬)।

১৮৯৬ সালের ২৬, ২৭, ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য এক আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ইসলামী নীতি-দর্শন পুস্তকটি প্রবন্ধ আকারে লিখেন। এতে সকল ধর্মের লোক অংশ গ্রহণ করেন। ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্মেলনের পূর্বে অর্থাৎ ২১শে ডিসেম্বর তারিখে ইশ্‌তিহারের মাধ্যমে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ২৭ ও ২৯শে ডিসেম্বর মোট ৬ ঘন্টা পাঠ করে প্রবন্ধ শেষ হলে সকলে একযোগে এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান করে। আর এভাবে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়।

প্লেগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

"আজ ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৮৯৮ সন) আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, আল্লাহ্‌তাআলার ফিরিশ্‌তাগণ পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় কালো রঙের এমন কিছু গাছের চারা রোপণ করছেন যা দেখতে কুৎসিত কালো ও বিভীষিকাময় এবং ছোট আকারে ছিল। আমি তখন ঐ চারা রোপণকারীদের প্রশ্ন করলাম এটা কিসের গাছ? তখন ঐ ফিরিশ্‌তাগণ বললেন - এটা প্লেগের বৃক্ষ।' অচিরেই পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে যার প্রাদুর্ভাব হবে এবং আমাকে এটাও জানান হলো যে, আগামী শীতকালেই এ রোগের বিস্তার ঘটবে এবং এটা মারাত্মক আকার ধারণ করবে" (ইশ্‌তিহার ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮)।

"তোমার এ গৃহের প্রাচীরের ভিতর যারা অবস্থান করবে আমি তাদেরকে বিশেষভাবে রক্ষা করবো" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

এ ভবিষ্যদ্বাণীর পর সমগ্র ভারতে বিশেষ করে পাঞ্জাবে মারাত্মকভাবে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। এবং ২/১ বছরেই কয়েক লক্ষ লোক মারা যায়। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আহমদীরা এ থেকে বিশেষভাবে রক্ষা পায়।

প্রতিশ্রুত পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

১৮৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে ৪০ দিন হুসিয়ারপুরে নীরব দোয়া ও ইবাদত (চিল্লাকশি) করে ২১শে ফেব্রুয়ারী এক ইশ্‌তিহার প্রকাশ করেন। যার কিছু দিক হলো-

"সুতরাং সুসংবাদ গ্রহণ করো এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেয়া হবে। এক অসাধারণ মেধাবী পুত্র সন্তান তুমি লাভ করবে। ... সে আল্লাহ্‌র নূর। ... তার সঙ্গে ফযলের আবির্ভাব হবে। ... জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। ... তার শিরে খোদার ছায়া বিরাজমান থাকবে। ... সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে" (ইশ্‌তিহার ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬)।

এ প্রতিশ্রুত পুত্র ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হলেন মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত ৫২টি বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে খেলাফতের দায়িত্ব পান। তিনি ৫২ বছর খেলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি জামাতে আহমদীয়ার সাংগঠনিক ভীতকে মজবুত করেন এবং জামাতের কার্যক্রমকে গতিশীল করেন। তার খেলাফত কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে মুবাল্লেগ প্রেরণ করা হয় এবং সারা বিশ্বে আহমদীয়ত ছড়িয়ে পড়ে। তিনি অসংখ্য বইয়ের পাশাপাশি কুরআনের দু'টি অমূল্য তফসীর, তফসীরে সগীর ও কাবীর রচনা করেন।

উপসংহার ঃ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) শ' শ' ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। যার গোটা কয়েক উপরে আলোচনা করতে পেরেছি। এখানে বুঝাতে চেষ্টা করেছি তাঁর সকল ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়েছে বা পূর্ণ হচ্ছে বা পূর্ণ হবে। আর এটি মূলতঃ তাঁর (আঃ) দাবীর সত্যবাদিতার অন্যতম প্রমাণ। যদি তিনি সত্যবাদী না হতেন, তার দাবী সত্য না হতো, তাহলে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কখনও পূর্ণ হতো না। উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়াও তিনি আলেকজান্ডার ডুই, পন্ডিত লেখরাম, আব্দুল্লাহ্ আথম, সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী, বিশ্বযুদ্ধ ও অগণিত বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যা পূর্ণ হয়েছে। এগুলো দেখে আজ চক্ষুষ্মান লোকেরা ঈমান আনছে আর অনুসারীরা ঈমানকে করছে মজবুত। হযরত ঈমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সকল ভবিষ্যদ্বাণী আরো অজস্র ধারায় পূর্ণ হোক, জগতের সকল মানুষ তাঁর উপর ঈমান আনুক, সমবেত হোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। আল্লাহ্‌তাআলার কাছে আমরা এ দোয়া করি, আমীন।

(মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান প্রাপ্ত)

- শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন

ঈদের দিনে করণীয়

রমযান মাসের পরে আসে শওয়াল। শওয়ালের প্রথম তারিখ সারা মুসলিম জাহান ঈদুল ফিতর বা ফিতরানা বন্টনের অথবা রোযা খোলার উৎসব পালন করে থাকে। ঈদুল ফিতরের দিনে আমাদের বিশেষ বিশেষ কিছু করণীয় আছে। সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

(১) ঈদের দিনে ফজরের নামাযে মসজিদে মুসল্লী যেন বেশি বেশি শামেল হয়। মাহে রমযানের উদ্যোগ-উদ্দীপনা যেন স্তিমিত না হয়ে যায়।

(২) ঈদের দিন সকাল বেলা গোসল করে সম্ভব হলে নতুন কাপড়, তা না হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে, সুগন্ধি লাগিয়ে ঈদের নামাযের জন্যে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকে প্রস্তুতি নিতে হয়।

(৩) ঈদের নামাযের পূর্বে সাধ্যমত মিষ্টান্ন ও ভাল খাবার তৈরী করে নিজেরা খেতে হয় এবং গরীব ও অভাবীদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের খাওয়াতে হয়।

(৪) ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় এক পথ দিয়ে এবং আসার সময় অন্য পথ দিয়ে আসতে হয় যেন বেশি বেশি লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয় সালামের আদান-প্রদান হয়। যেতে আসতে 'তকবীর' পাঠ করতে হয়। 'তকবীর' সম্বন্ধে পরে বলা হচ্ছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এক খুতবায় বলেছেন- হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর সঙ্গে আমরা যখন ঈদের মাঠে যেতাম ও ফিরে আসতাম তখন তা একটা মিছিলের রূপ ধারণ করতো।

(৫) ঈদের মাঠে বা মসজিদে ২ রাকাআত ঈদের নামায (সুন্নতে মুয়াকাদাহ্) সূর্য মাথার ওপরে আসার পূর্বে বাজামাত পড়তে হয়। দু'রাকাত নামাযে প্রথম ৭ তকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবর-আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) এবং দ্বিতীয় রাকাআতে ৫ তকবীর পাঠ করতে হয়। এগুলো নামাযের স্বাভাবিক তকবীরের অতিরিক্ত।

প্রথম রাকাতে ছানা পাঠ করার পরে এবং দ্বিতীয় রাকাআতের সিজদাহ্ থেকে দাঁড়িয়ে এ অতিরিক্ত তকবীর পাঠ করতে হয়।

(৬) ইমাম সাহেব নামাযের পরে ঈদের খুতবা (যুগ-খলীফার খুতবা বা নিজের পক্ষ থেকে খুতবা) দেন এবং মুনাজাত করেন।

(৭) ঈদের নামাযের পূর্বে যেন অবশ্যই ফিতরানা (রমযান মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে জামাতী ঘোষণা মুতাবেক ফিতরানা পরিবারের সবার পক্ষ থেকে এমন কি কাজের লোকের পক্ষ থেকে ও আদায় করা ভাল) ও ঈদ ফান্ড আদায় করে দেয়া আবশ্যক। ঈদ ফান্ডের চাঁদা পরেও আদায় করা যেতে পারে।

(৮) কোন বিশেষ কারণে ঈদুল ফিতরের নামায পূর্বাহ্নে পড়তে না পারলে ২রা শাওয়াল এবং ঈদুল আযহার নামায ১১ই যিলহজ্জ পড়ার বিধান রয়েছে।

(৯) ঈদুল ফিতরের নামায শেষে সকলে নিম্নোক্ত তকবীর কমপক্ষে ৩বার পাঠ করবেনঃ

আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ - আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ আর সব প্রশংসা তাঁরই।

(১০) ঈদের খুশীতে অভাবী বা কম আয়ের লোকদের শামেল করার জন্যে বিত্তবানদের কর্তব্য, তারা যেন তাদের বাড়ীতে যান এবং সামান্য হলেও কিছু উপহারাদি নিয়ে যান। এ ব্যাপারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জামাতের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন।

ঈদের দিনে অযথা বা বেহুদা খরচ থেকে বিরত থেকে একমাস রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার যে কষ্ট উপলব্ধি করা গেছে তাতে উদ্দীপ্ত হয়ে অভাবী লোকদের মুখে হাসি ফুটানোর জন্যে যেন বিত্তবানরা চেষ্টা করেন। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে এগুলোর ওপরে সত্যিকারভাবে আমল করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

- মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

ওয়াকফে নও মুজাহিদের সাথে পরিচিত হোন

মুবাশ্বের আহমদ নং ৬৯৮১ বি
পিতা ঃ মুদ্দাস্সের আহমদ
দাদা ঃ আব্দুস সামাদ
তারুয়া জামাত

শোক সংবাদ

আমার বড় ভাই রঘুনাথপুরবাগ মজলিসে আনসারুল্লাহ্র যয়ীম সাহেব গত ৯/১১/০২ইং সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- **শাহ্ আলম**
রঘুনাথপুর বাগ

❑ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, সুন্দরবন-এর মোতামাদ জনাব এস, এম, তরিকুল ইসলামের স্ত্রী মোসাঃ জেসমীন পারভীন (লিপি) গত ২৫/১১/০২ রাত ৯টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ... রাজেউন)। মরহুমা এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।
তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

- **ফারুক আহমদ**
লাইব্রেরীয়ান

শুভ বিবাহ

❑ মোঃ দানিয়াল আফ্রাদ-এর কন্যা মোসাম্মাৎ নাজনীন আক্তার (শোভা), সাং- মল্লিক হাটি, ঈদগাহ মাঠ, জেলা-নাটোর-এর সাথে জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান-এর পুত্র জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম খান (শান্ত), গ্রাম- বগুড়া, ডাকঘর-বাগমারা, থানা-উল্লাপাড়া, জেলা-সিরাজগঞ্জ-এর বিয়ে ৭৫,০০১/= (পঁচাত্তর হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৫/১০/০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেবাড়ীয়া জামে' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব আমীর হোসেন, ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত তে-বাড়ীয়া। কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং- ০৩১২/০২ তারিখ ২০/১১/০২।

❑ মোঃ ইউসুফ আলী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ কোহিনূর বেগম, সাং- রঘুনাথপুর বাগ, থানা-ঝিকর গাছা, জেলা-যশোহর-এর সাথে জনাব আবূ দাউদ মোড়ল-এর পুত্র জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, সাং- যতীন্দ্র নগর, ডাকঘর-যতীন্দ্রনগর, থানা- শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর বিয়ে ২৫,০০০/= (পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৮/১০/০২ তারিখ, রোজ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুর বাগ জামে' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, মোয়াল্লেম। কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং- ০৩১১/০২ তারিখ ১৭/১১/০২।

❑ মোঃ আতাউর রহমান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ সুলতানা রাজিয়া চৌধুরী হেপী, সাং-জামালপুর, ডাকঘর- শাকীর মুহাম্মদ, থানা-চুনারুঘাট, জেলা-হবিগঞ্জ-এর সাথে জনাব শহীদ আহমদ-এর পুত্র জনাব ফজল আহমদ বাবুল, সাং- আহমদ নগর, ডাকঘর-ধাক্কামারা, জেলা-পঞ্চগড়-এর বিয়ে ৫০,০০১/= (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২২/০৭/০২ তারিখ, রোজ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জামালপুর জামে' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন, পিতা শহীদ আহমদ। কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং- ০৩১০/০২ তারিখ ১৫/১১/০২।

❑ জনাব মোসলেম আলী খলীফা-এর কন্যা মোসাম্মাৎ লুৎফা বেগম, সাং- কৃষ্ণনগর, ডাকঘর- কুকুয়া, জেলা-বরগুনা-এর সাথে জনাব শাহজাহান মাতবর-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, সাং- পূর্ব কৃষ্ণনগর, ডাকঘর-সোহরাওয়ার্দী হাই স্কুল, জেলা-বরগুনা-এর বিয়ে ৩০,০০০/= (ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৫/০৪/০২ তারিখ, রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কুকুয়া জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ শাহ্ আলম খান, পিতা- মরহুম নূর হোসেন। কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং- ০৩০৯/০২ তারিখ ১৪/১১/০২।

❑ ডাঃ মেজর (অবঃ) আসাদউজ্জামান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ আমাতুস্ সালাম তামান্না, সাং-বাইতুল এরফান, কুলগাঁও, জালালাবাদ-এর সাথে জনাব মীর মোহাম্মদ শফী-এর পুত্র জনাব মীর ওয়াজেদ আলী, বাড়ী নং-৩১, রোড নং-২, সেকশন ১২/বি, মীরপুর, ঢাকা-১২১২। -এর বিয়ে ১,৫০,০০১/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৬/০৯/০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামস্থ বায়তুল বাসেত জামে' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব এস, এ, নিজামী, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং- ০২৯৪/০২ তারিখ ১৩/০৯/০২ এসব বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ওয়াকফে জাদীদ-এর চাঁদা আদায় করুন

৩১শে ডিসেম্বর, ২০০২ তারিখ ওয়াকফে জাদীদের বছর শেষ হতে যাচ্ছে। সকল আমীর, মুবাল্লিগ, মুয়াল্লিম প্রেসিডেন্ট ও ওয়াকফে জাদীদের সেক্রেটারী সাহেবানের খেদমতে এ আবেদন বর্তমান আর্থিক বছরের ওয়াদাগুলোর প্রেক্ষিতে এখন চাঁদা আদায়ে যে কমতি রয়েছে তা পুরো করার জন্যে সচেষ্ট হবেন। আর এমন সব ব্যক্তি যারা এখনও এ কল্যাণমন্ডিত তাহরীকে অংশ নেন নি তাদেরকে এতে অংশ গ্রহণ করানোর জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা নিন। শিশুদের জন্যে আতফালের দপ্তর চালু করা হয়েছে। চেষ্টা করুন যেন প্রত্যেক আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এ কল্যাণময় তাহরীকে অংশ গ্রহণ করেন। জাযাকুমুল্লাহ্ আহসানাল জাযা।

এডিশনাল ওকীলুল মাল, লন্ডন

অনুবাদ - নির্বাহী সম্পাদক

ক্রোড়া মজলিসের উদ্যোগে একটি বিশেষ ওয়াকারে আমল

৩০ অক্টোবর '০২ প্রতিদিন শত শত লোকের চলাচলকারী ক্রোড়ার একটি প্রধান সড়কের ভাঙ্গা স্থান ক্রোড়ার ৮ জন খাদেম ৪ ঘন্টায় ভরাট করে জন সাধারণের নির্বিঘ্নে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে। তারা দোয়া প্রার্থী।

- আফজালুর রহমান রিপন, কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ক্রোড়া

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর সর্ব শেষ স্বাস্থ্য বুলেটিনে বলা হয়েছে- তিনি (আইঃ) দ্রুত আরোগ্য লাভ করছেন। সবকিছু নর্মাল। অফিসের কাজও দেখা-শুনা করছেন।

তাঁর পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের জন্যে দোয়া, সদকা ও নফল ইবাদত অব্যাহত রাখার জন্যে বলা হয়েছে।

- *নির্বাহী সম্পাদক*

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

CONCORD

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৮৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 65 ◆ 10th Issue November 30, 2002 ◆ Tk. 10.00

Fortnightly The AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

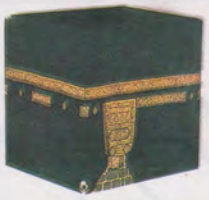

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com